উত্তর-আধুনিকবাদ : শহীদুল জহিরের ছোটগল্প

নিপা জাহান*

Abstract: Typically post-modernism is a cluster theory. Reader's can notice this theory in the chapterization and in good poeaticl fiction/ diction. In contemporary Bangladeshi literature, the mentionable thing of the practice and relevance of Shahidul Jahir in his literature is the different post-modernist experiments. This story writer has applied the theoretical application widely in a few stories included in his short-stories as a fore runner literati of the present time. Sometimes this theory is inconspicuous and again is manifested almost directly in his short stories. Ideologically as a writer close to society, Shahidul Jahir has selected the incident, character and dialogues of his stories from the politics, country and also from the core of the culture. For this reason, Liberation War and it's overall influence and reaction are manifested in his stories. The synthesis of post-modernist theory with the above statid subjects has added a splendor never before tasted in his literature.

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) অবস্থান স্বতন্ত্র। গত শতাব্দীর আশির দশক থেকেই কথাসাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থান। বরাবরই তিনি ছিলেন সৃজনপ্রক্রিয়ায় নিবিষ্ট ও নিভৃতচারী। ঢাকার সাহিত্যাঙ্গনে মাত্র এক যুগ আগে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পরিসর সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে তা ব্যাপকতা অর্জন করে। তিন দশকব্যাপী[১] ব্যাপ্ত সাহিত্য-জীবনে মাত্র সাতটি গ্রন্থরচনার[২] মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিমিতিবোধ, নিরীক্ষাপ্রিয়তা ও বৈচিত্র্যকে চমৎকারভাবে ধারণ করেছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের হালচাল এবং বাংলা সাহিত্যের ক্রমাগ্রসরমান ধারাপ্রক্রিয়া স্বীকরণ করেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় পূর্বসূরিদের প্রভাব[৩] থাকলেও পুনরাবৃত্তি নেই। একথা ঠিক যে, শহীদুল জহির যেকোনো বড়ো লেখকের মতোই অগ্রজপ্রতিমদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন প্রভাবিত হয়ে, কিন্তু হেঁটেছেন স্বসৃষ্ট পথে। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-অনুসৃত চেতনাপ্রবাহরীতি ও অস্তিত্ববাদ শহীদুল জহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না, কিন্তু এর পরোক্ষতাও গোপন থাকে না; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পুরান ঢাকার জনজীবনবৈশিষ্ট্য তার নির্মাণ থেকে দূরবর্তীই থাকে। সৈয়দ শামসুল হকের পরোক্ষ ও যৌথ বয়নরীতি শহীদুল জহিরের উপস্থাপনায় জটিল ও সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে; গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বর্ণনার বিচূর্ণ-সময়ক্রম ও জাদুবাস্তববাদের[৪] প্রয়োগ তাঁর কথাশিল্পে ভিন্ন স্থান-কাল পটভূমি ও প্রয়োগরীতি-আশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অল্প বয়সে বামপন্থী মতাদর্শে আস্থা[৫], সময় ও সমাজের পরিবর্তমানতা উপলব্ধিতে সক্ষমতা, নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় আর্থ-রাজনৈতিক কর্ম-কৌশলের অভিজ্ঞতা[৬] এবং ব্যক্তিগত অভিরুচিতে সঙ্গ[৭] ও সংঘহীনতায় তাঁর সাহিত্যে যোগ হয়েছে বিশেষ অনুষঙ্গ ও মাত্রা।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কৈশোর ও প্রারম্ভিক যৌবনে শহীদুল জহির প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানি শাসকচক্রের নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্তাক্ত উন্মেষ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গর্বিত প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান পর্ব থেকে বাংলাদেশ পর্বে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিকসমূহ তাঁর কথাসাহিত্যে তাই ব্যাপকভাবে বিধৃত। রাজধানী ঢাকায় বসবাসের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তরসমূহ তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে। আবার পিতার কর্মসূত্রে আশৈশব দেশের নানা অঞ্চলের জীবনচর্যা, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এবং সেইসঙ্গে চাকরিসূত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ও যাপন-অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটেছিল শহীদুল জহিরে। তাঁর কথাসাহিত্যে এ-সবের প্রভাব-চিত্র-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাঁর উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পের প্রধান স্থানিক পরিমণ্ডল পুরান ঢাকা; বিশেষত নারিন্দা, ভূতের গলি, দক্ষিণ মৈশুন্দি। তদুপরি উত্তরবঙ্গের সুহাসিনী গ্রাম ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়া তাঁর গল্প-উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত দুটি স্থান। উল্লেখ্য, কেন্দ্র ও প্রান্তের ভাষিক বৈচিত্র্যের সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট এসব স্থান অনির্দেশ্য ও নির্বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁর বিশেষ নির্মাণ-কৌশলের কারণে। তাঁর ছোটগল্প বিশ্লেষণে যথাস্থানে এই বক্তব্যের সারাৎসার প্রতিপন্ন হবে। বস্তুত কেবল স্থান নয়, ঘটনা ও চরিত্রেরও অনুরূপ নির্মাণ তিনি করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রবণতার উল্লেখযোগ্য উপস্থাপক মার্কেস।[৮] জাদুবাস্তবতার ব্যবহার, বর্ণনায় সময়ক্রমকে ভেঙে দেয়া, ধারাবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের অধিগ্রহণ, উত্তমপুরুষ বা মধ্যম পুরুষের পরিবর্তে সর্বজ্ঞ বয়ানে সামাজিক যুক্ততার স্বরগ্রাম তৈরিতে শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্য তুলনাবিরল।

পারাপার

শহীদুল জহিরের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *পারাপার* (১৯৮৫)। এ-গ্রন্থভুক্ত পাঁচটি গল্পের প্রায় সবগুলোতেই আধুনিকবাদী নানা বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উত্তর-আধুনিকবাদ যেহেতু মোটের ওপর কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বা কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনাচারকে গুরুত্ব দেয়, সেই সূত্রে গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোর উত্তর-আধুনিক পাঠ নির্মাণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও সম্ভব[৯]।

*পারাপারে*র প্রথম গল্প 'ভালোবাসা'য় বাবুপুরা বস্তির দুই নর-নারী হাফিজুদ্দি ও তার স্ত্রী ঠিকা ঝিয়ের কাজ করা আবেদার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি ডালিয়া ফুলকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এর উপজীব্য মূলত অন্তেবাসী মানুষের আবেগের রূপায়ণ; যা বাংলা সাহিত্যের কল্লোলের কালেও কথাসাহিত্যিকদের অন্বিষ্ট ছিল।[১০] 'তোরাব সেখ' গল্পটিও বয়সের ভারে ন্যুব্জ, কর্মহীন বস্তিবাসী তোরাব সেখের পারিবারিক জীবনের চিত্র। বয়স ও উপার্জন-সক্ষমতা কীভাবে একটি পরিবার-কাঠামোর ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে, এতে তা-ই প্রকাশিত। 'পারাপার' গল্পটি ক্ষমতার অন্য এক আদলকে প্রকাশ করে। উচ্চপদস্থ এক সরকারি চাকুরের প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ, কর্মপ্রার্থী তরুণ ওলির শ্রেণি-শাসিত চিন্তা এবং আবুল ও বশির নামক দুই শিশুশ্রমিকের বিবিধ কর্মে এই ক্ষমতাস্তরের নানাদিক উন্মোচিত। শৃঙ্খলিত ও অবদমিত 'সিস্টেমে'র ভেতর থেকে মানব-বোমার সৃষ্টি ও বিস্ফোরণের যে কথা উত্তর-আধুনিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক তাত্ত্বিকগণ বলে থাকেন[১১], অল্প পারিশ্রমিকে বেডিং বহনকারী আবুল কর্তৃক নদীতে মালামাল ফেলে দেয়ায় এবং বাদানুবাদের এক পর্যায়ে অপদস্থ ওলি কর্তৃক পদস্থ অফিসারটির চোয়াল স্পর্শ করায় এই গল্পে তার রূপায়ণ ঘটেছে। 'মাটি এবং মানুষের রং' গল্পেও আম্বিয়ার বিস্ফোরক-প্রতিবাদে ঘটেছে এরূপ আরেক দিকের উন্মোচন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক অবস্থান ও প্রত্যাশিত প্রজন্ম নির্মাণাকাঙ্ক্ষার সমীকরণ মেলাতে ব্যর্থ আসিয়া খাতুন কালো ও দরিদ্র আম্বিয়াকে পুত্রবধূ করেনি। কিন্তু পরে যখন নিজের ঘেয়ো নাতির তুলনায় 'মুনীষ-বৌ' আম্বিয়ার সন্তান দৃশ্যত প্রশংসনীয় দেহসৌষ্ঠবের হয়ে ওঠে, তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ আসিয়া খাতুনের ক্রোধান্বিত কণ্ঠে নিঃসৃত হয় অপবাদমূলক বাক্য – 'ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়'। (জহির : ২০০৭ : ৩৯)

প্রতিউত্তরে 'শুকনো' ও 'নিচু গলায়' আম্বিয়া এ-পর্যায়ে রোদে পুড়ে ক্ষেতে কাজ করা মুনীষের কর্মবাস্তবতার কথা স্মরণ করায় সংহতভাবে; অপমানিত আম্বিয়া তাকে দেয়া অপবাদের পাল্টাসূত্র ছুঁড়ে দেয় 'চাচি'-সম্বোধিত আসিয়াকেও। এভাবে শেষোক্ত তিনটি গল্পে প্রান্তিক মানুষের প্রত্যাহিকতালগ্ন আত্মমর্যাদার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে; দেখা যায় বিবিধ স্তরের ক্ষমতা কীভাবে অপেক্ষাকৃত 'ছোট'-কে আঘাত করে, আর এই আঘাত থেকেই প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়; ঘুরে দাঁড়ায় ক্ষমতাহীন। অর্থাৎ একটি সিস্টেমের সাবল্টার্ন কথা বলতে পারে।[১২] আর এখানেই উত্তর-আধুনিক চিন্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে উক্ত গল্পত্রয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।

'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পটি এই গ্রন্থে ভিন্নধর্মী। পুরান ঢাকার আনন্দ পাল লেনে এক সরকারি ব্যাংকের মেথরের আগমন, আচরণ ও যাপনকেন্দ্রিক সমস্যা এই গল্পের উপজীব্য। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের মতো ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীনের দ্বন্দ্ব এই গল্পেরও প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এতে ছন্নছাড়া এক মানুষের স্মৃতি ও স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হবার উপক্রম ঘটে সমাজের ক্ষমতাবান কর্তৃক ক্ষমতাহীনকে নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে। প্রবল বৃষ্টিতে সন্তানসহ অসহায় এক নারীকে আশ্রয় প্রদানের ঘটনাসূত্রে আলফাজুদ্দিনের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর বিবাহ-সংঘটনে উদ্যোগী হয় মহল্লার মানুষ। এই ঘটনাসূত্রে গল্পকার একটি সমাজ-কাঠামোর স্তরীভূত ক্ষমতাবিন্যাসকে এই গল্পে যেমন নির্দেশ করেছেন ঠিক তেমনি এর পরিণতিও প্রদর্শন করেছেন। গল্পকারের এই নিরীক্ষার উপলক্ষ সৃষ্টি হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র আলফাজুদ্দিন ওরফে নবাব-কে কেন্দ্র করে। এই চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-পর্যালোচনায় লেখকের উদ্দিষ্ট নিরীক্ষাকে অনুধাবন সম্ভব। আলফাজুদ্দিনের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ থেকে আগত। তার বাবা আনছারউদ্দিন কুষ্টিয়ার এক ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সার্বক্ষণিক খেদমতগার হওয়ায় গ্রামের লোক তাকে 'লেঙ্গুর' বলে ডাকতো। পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষাসূত্রে সে জানে – 'গরিবের রাগ থাকতি নেই'। (জহির : ২০০৭ : ৪৮) তার বাবার জমি ছিল না, 'ছিল মুর্শিদাবাদ সূত্রীয় একটা অতিপ্রাকৃত অলৌকিক গর্ববোধ, ধূর্ত চাহনি আর রেশমের মতো মোলায়েম একটা স্বভাব।' (জহির : ২০০৭ : ৪৮) দুই স্ত্রীর সংসারে তার বাবা বড়ো স্ত্রীকে সমীহ করতো। কারণ বড়ো স্ত্রীর ছেলেমেয়েগুলো বড়ো হয়ে উঠছিল। এদিকে প্রবঞ্চিত, দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন নিয়ে আলফাজুদ্দিন কৃষিকাজ, দোকানদারি, তারপর বাবার মতো চেয়ারম্যানের সহযোগী হবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সৎভাইদের কাছে বাস্তুভিটা পর্যন্ত বেচে দিয়ে 'নির্ভার' হয়েছিল। কিন্তু জরিনার বন্ধনে সে হঠাৎ আবদ্ধ হয়ে পড়ে; এবং জন্ম নেয় তাদের সন্তান রফিক। জরিনার মৃত্যুর পর নিষ্কর্মা আলফাজুদ্দিনের জীবনযুদ্ধ ভিন্নদিকে মোড় নেয়। তখন 'যুগের সময় ভাটার টানে গড়াচ্ছিলো', উত্থান ঘটছিলো ছোট-বড় দখলদার আধিপত্যকামীর। আর এই পরিবর্তনের স্রোতে আন্দোলিত হচ্ছিল ধর্মরক্ষক পর্যন্ত! আনন্দপাল লেনের বেওয়ারিশ রোয়াক দখল করে মন্দিরের পুরোহিত নেপাল ঠাকুর জায়গাটিকে অবকাঠামো দেয় ভাড়ায় খাটাবে বলে। স্থান-স্বল্পতা বিবেচনায় তা দোকানের জন্য ভাড়া দেবে মনস্থির করার পর হঠাৎ আগমন ঘটে আলফাজুদ্দির। দখলদার পুরোহিত একে মধুসূদনের কৃপা মনে করলেও দুমাস ঠিকমতো ভাড়া পাবার পর যখন আর ভাড়া পাচ্ছিল না তখন তা উটকো ঝামেলায় পরিণত হয়। ভাড়া পরিশোধের ব্যর্থতায় আলফাজুদ্দির ঘরের পানি-বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়, পাশের এক বাসা-সংলগ্ন ফাটা পাইপের পানিতে তাকে স্নানাদি সারতে হয়। ফজলুর মনিহারি স্টোর ও পুরি দোকানে দেনা, তাই তাদের ক্ষোভ ও বিরক্তি; বদ্ধ ঘরের বাইরে বসার মতো একমাত্র জায়গার উলটো দিকে এখলাস সাহেবের বাসা, দোতলার দিকে তার তাকানোতে তাই এখলাসের বিড়ম্বনা। এদিকে পেশায় মেথর হওয়ায় তার প্রতি সকলের ঘৃণা। আবার পূর্বপুরুষ যেহেতু মুর্শিদাবাদী, এবং উচ্চারিত ভাষাও শুদ্ধ, সেহেতু ঠাট্টাচ্ছলে তার নাম হয়ে আছে 'নবাব'। এলাকার স্থায়ী অধিবাসী না হওয়ায় সে এই মহল্লার ভোটারও নয়। নির্বাচনের সময় কমিশনার পদপ্রার্থীর হয়ে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করলেও ভোটের দিন ভোটদানে ব্যর্থ

হওয়ায় দোকানি ফজলুর সঙ্গে কথোপকথনে পাঠকের সামনে উঠে আসে তার ভোটাধিকার প্রসঙ্গ; তার ও জনগণের রাজনীতিবোধের চালচিত্র। ফজলু-নবাবের এ-সংক্রান্ত কথোপকথন নিম্নরূপ –

> ভোট দিলা না?
> না, আমি ভোট দেই না। মুচকি হেসে বলল নবাব, টাকা থাকলে আমিই দাঁড়াতাম।
> তোমার লাহান গরু-ছাগলরে ভোট দিত ক্যাডা!
> তোরাই, যারা গরু-ছাগলকে ভোট দিয়ে এলি। (জহির : ২০০৭ : ৪৬)

এই কথোপকথনের সারসত্য যখন ফজলু নবনির্বাচিত এরশাদ কমিশনারকে জানায়, নবাব তখন কমিশনারকে 'হুজুর' সম্বোধন করে ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পায়। টিকে থাকার জন্য তোষামুদে এই ভাষাটুকুই নবাবের অবলম্বন। তাই গল্পকার জানান – 'নবাবকে ভাঙা সহজ হয় না। কারণ নবাব ভাঙার আগেই ভেঙে থাকে। এটাই জীবন। নবাব তা-ই ভাবে।' (জহির : ২০০৭ : ৪৭) নিজের ওপর নেমে আসা অপমান তার সয়ে গেলেও স্কুলগামী সন্তানের অপদস্থ হবার সংবাদে সে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আশা রাখে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে সমস্যাসঙ্কুল নিত্য-দিনাতিপাতের মাঝখানে একদিন ছোট্ট সন্তানসহ এক অপরিচিতা নারী তার ঘরের সামনে বৃষ্টিতে আটকে পড়ে। মানবিকতার খাতিরে নবাব তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু এর ভিন্ন ও কুৎসিত গল্প পৌঁছে যায় বা পৌঁছে দেয়া হয় কমিশনার তথা ক্ষমতাধরদের কাছে। ফলে পূর্ব থেকেই নবাবের ওপর বিরক্ত সবাই একজোট হয়ে জড়ো হয় নবাবের ঘরে ; তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় আশ্রিতা ঐ নারীর। আপাতভাবে দিশাহীন নবাব ঘোরের মধ্যে থেকেই অবশ্যম্ভাবী এই ঘটনাকে মেনে না নিতে দৃঢ়চিত্ত হয়; আর 'অপেক্ষা করে, তারপর'। (জহির : ২০০৭ : ৫৪) এ পর্যায়ে ছন্নছাড়া, আপাত-আত্মমর্যাদাহীন নবাব পাঠককে চমকে দেয়; এবং সে অর্জন করে পাঠকের আগ্রহ ও সহানুভূতি। সত্য এটাই যে, পতনোন্মুখ এমন সাধারণ মানুষই উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের আলোচ্য ও অন্বিষ্ট। আর এমন সাধারণ ও প্রাণান্ত জীবন-সংগ্রামী মানুষ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোয় নিষ্পেষিত হয়ে পরিশেষে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে আলফাজুদ্দিনের পরিবর্তিত জীবনাচরণসূত্রে তা-ই গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে। চরিত্রটি এই গল্পে সৃষ্টি করেছে পলিফনি বা বহুস্বর[১৩]।

বর্তমান আলোচনায় 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পের প্রধান চরিত্র নবাবের জীবন-বোধ ও জীবন-সংগ্রামের ক্রম-বিন্যস্ত যে রূপ উপস্থাপিত হয়েছে, গল্পে সে-সবের বিন্যাসপ্রক্রিয়া তেমন মোটেই নয়। পারম্পর্যহীন ঘটনাংশ ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গতানুগতিক ধারাকে পরিহার করেছেন শহীদুল জহির। গল্পাংশটি তিনি বিন্যস্ত করেছেন তাঁর প্রিয় ও পরিচিত ভূগোল পুরান ঢাকার স্থানিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য মনোবাদী ও সাংস্কৃতিক বস্তুবাদের[১৪] আলোকেই এই গল্পের পাঠ-নির্মাণ চলে; যে সূত্র ইতোমধ্যে এই আলোচনায় প্রযুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থভুক্ত প্রথম গল্প বাদ দিয়ে বাকি চারটি গল্পের পাঠই ক্ষমতাতত্ত্বকে সামনে আনে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গল্পের ভেতর মার্কসীয় শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিহীনের প্রতিরোধ-প্রকল্প কেউ কেউ আবিষ্কার করতে পারেন। তবে শেষ গল্পে এই প্রকল্প পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। গল্পটির ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, প্লটহীনতা, সময়ক্রমের ভগ্নতা প্রভৃতি নানামাত্রিক দিক এক করে তুলেছে জটিল ও রহস্যময়।

ডুমুরখোকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প

শহীদুল জহিরের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯) পাঠে প্রথমেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে গল্পের বিষয় নির্বাচন ও নির্মাণের বৈচিত্র্য। গ্রন্থের 'ধুলোর দিনে ফেরা' গল্পটি বাদে সাতটি গল্পেরই পটভূমি মূলত ক্রম-শিল্পায়িত রাজধানী ঢাকা। নানা আয়োজনে নৈমিত্তিকতার ভেতর অনৈমিত্তিকতা, অলৌকিকতা, অ্যাবসার্ডিটি (উদ্ভটত্ব) ও জাদুবাস্তববাদের উপস্থিতি ঘটান গল্পকার। গল্পের চরিত্রগুলোও আশি-নব্বই দশকের ঘটমান রাজনীতির ভেতর ঘূর্ণ্যমান। তবে রাজনীতি তাঁর গল্পে মৃদুভাবে এসেছে, কখনো নিয়ামক-ভূমিকা পালন করেও প্রায়শই খণ্ড কাহিনি বা ঘটনাসমূহের

আধিপত্য বিস্তারকারী বর্ণনার ভেতর তা তলিয়ে গেছে। এভাবেই কথার ভেতর জহির যোগ করে নেন তাঁর গাল্পিক উদ্দেশ্য, অথচ অব্যক্তভাবে ছড়িয়ে রাখেন গভীরভাবে ভাববার মতো নানা সূত্র। এসব সূত্র একাকার হয়ে যায় বৈশ্বিক সাহিত্যিক-মতাদর্শিক আন্দোলনের সঙ্গে, সমকালে প্রবলভাবে চর্চিত উত্তর-আধুনিকবাদের বিবিধ অনুষঙ্গের সঙ্গে।

অকিঞ্চিৎকর কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পের সৃষ্টি শহীদুল জহিরের পুনরাবৃত্ত প্রবণতা। এই দৃষ্টান্ত প্রথম মেলে তাঁর প্রথম গ্রন্থের গল্পেই। একটি বস্তু (ডালিয়া ফুল) ক্রমে একটি বোধ বা অনুভবে (ভালোবাসা) বিস্তৃত হয়ে তাতে সম্পন্ন করেছিল গল্পের বৃত্ত। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পেও তেমনি অকিঞ্চিৎকর বস্তু-উপাদান (নয়নতারা ফুল) গল্প-নির্মাণের নানামাত্রা (মাল্টি-ডাইমেনশন)-কে সামনে এনেছে। নির্দিষ্ট একটি স্থানিক প্রেক্ষাপটকে (আগারগাঁও কলোনি) কেন্দ্রে রেখে এই গল্পে যথাক্রমে নাগরিক বিচ্ছিন্নতা, দাম্পত্য-সংকটের ধরন, অপরিকল্পিত নগরায়ন সমস্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সংকট, সর্বপ্রাণবাদী ধারণা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটেছে। সরকারি কেরানি আবদুস সাত্তারের 'বোধহীন ক্লান্তিকর' চাকরি আর 'স্পর্শযোগ্য' অন্ধকার বিষয়ের অবতারণা করে নাগরিক মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্যহীন জীবন, কর্ম ও অনুভবের বিষয়টি গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন গল্পকার। এদিকে তার সৌখিন স্ত্রী শিরীন বানুর তৎপরতায় বাসার সর্বত্র টবে ও বারান্দায় নয়নতারাসহ বিভিন্ন ফুল ও শোভাবর্ধক গাছে গড়ে ওঠে 'সবুজ জগৎ'। শিরীন বানুর সহায়তায় প্রথমে পুরো ভবন তারপর গোটা কলোনির নারীরা নিজেদের বাসভবনকে বৃক্ষ-উদ্ভিদময় করে তুলতে সচেষ্ট হয়। এতে–

> ...বাহ্যত প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক মানুষের সম্পর্কের যে ভারসাম্য ছিন্ন হয়েছে বলে জ্ঞানীজনেরা মনে করে, তা এই ভবনটির ভেতর যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি মানুষের সঙ্গে কলোনির এই ভবনের অধিবাসী মানুষদের সম্পর্কের যে নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে, তাও যেন কবিতায় গুল্মজাতীয় গাছের সবুজ পত্র-পল্লবকে ঘিরে মেরামত হয়ে ওঠে। (জহির : ২০০৭ : ৫৬)

তবে বৃক্ষাদির প্রতি আবদুস সাত্তারের আগ্রহ মৃত্যুর আগ-পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকে। সাত্তার চরিত্রটির নির্বিকারত্ব এই গল্পে একটি লক্ষযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এমনকি, কলোনির হলুদ-রঙা ভবনের সামনে প্রচুর লালচে বেগুনি ফুল ফুটলে পাশের বিমানবন্দরের ঝোপঝাড় থেকে প্রজাপতির দল এসে নাচতে শুরু করে। ফলে প্রজাপতির স্থায়ী আবাসন ও বংশবিস্তারের কথা ভেবে যখন কলোনির লোকেরা ভয় পেয়ে যায় তখনও প্রজাপতির পাখার ঝাপটায় তার মুখে, চিবুকে, কানের পিঠে হলুদ রেণু জমা হয়; কিন্তু আবদুস সাত্তার ভয় তো পায়ই না, বরং –

> সে তাকিয়ে দেখে, হাত দিয়ে কানের গহ্বর থেকে প্রজাপতি পাখার রেণু সাফ করে, জামার ভিতর প্রজাপতি ঢুকে গেলে ছাড়িয়ে দেয়, মনে হয় যেন এইসব পতঙ্গের অধিকারের ভেতর বসবাসে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, (জহির : ২০০৭ : ৫৭)

এভাবে প্রকৃতির পুষ্প, বৃক্ষ, উদ্ভিদ ও পতঙ্গের সঙ্গে তার 'অসুবিধা'হীন কিংবা স্বাভাবিক যাপন তৈরি হয়। আর গল্পকারের হাতে সূত্রপাত ঘটে পরিবেশবাদী এই গল্পের (ইকো-স্টোরি)[১৫]। উল্লেখ্য আলোচ্য গল্প রচনার[১৬] মাত্র দু-বছর আগে পশ্চিমে জোরালো হওয়া ইকোক্রিটিসিজম ধারণাটির সঙ্গে গল্পকারের যে-কোনোভাবে পরিচয় ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়। কারণ কেবল এই গল্প নয়, এই গ্রন্থের আরো দু-একটি গল্পে এই ধারণার ছাপ লক্ষ করা যায়; যেমন, 'এই সময়' ও 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস'। ইকোক্রিটিকগণ মনে করেন–

> প্রকৃতি কবি সাহিত্যিকদের মানসলোকের কল্পনা নয়, নয় ডিসকোর্সজাত অস্তিত্বও, যা বাকনির্ভর। একথা বলে তাঁরা একদিকে যেমন দীর্ঘসময় লালিত সেই রোমান্টিক ধারণাটির মূলে কুঠারাঘাত করেন যে, প্রকৃতি তাই যা মানবমন প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাবে, তেমনই দেরিদা-ফুকো পরবর্তী সময়ে অস্তিত্বের বস্তুবাদী প্রমাণকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো অস্তিত্ব আসলে বাকনির্মিত, ডিসকোর্সজাত এই

> ধারণাটিকেও আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ জরুরি, কেননা প্রকৃতিকে মানসলোকের কল্পনা বা বাকনির্মিতি বলে ধরে নিলে প্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্বটি-ই অস্বীকার করা হয়, তখন সেই প্রকৃতির ক্ষতি-বৃদ্ধি নিয়ে ভাববার আর অবকাশ থাকে না। ইকোক্রিটিকসরা তাই বারবার মনে করিয়ে দিতে চান যে প্রকৃতি একটি বাস্তব অস্তিত্ব—এটি 'স্পেসিয়াল' এবং 'ফিজিক্যাল'। এই সত্য মাথায় রেখেই সমালোচক আর কবি-সাহিত্যিকদেরও প্রকৃতির সঙ্গে মানবসম্পর্ক নিরূপণ করা উচিত। দ্বিতীয় যে সাধারণ লক্ষণটি প্রায় সব ইকো-ক্রিটিকদের রচনায় ফুটে উঠেছে তা হল পৃথিবী এবং প্রকৃতি সম্পর্কে মানবসভ্যতার 'অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক' (বা মানবকেন্দ্রিক) ধারণাটির পরিবর্তে 'ইকোসেন্ট্রিক' বা 'বায়োসেন্ট্রিক' ধারণাটি গ্রহণের পক্ষে সওয়াল। অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশকে দেখতে শেখায় মানুষকে পরিবেশের কেন্দ্রে, আর পরিবেশের অন্য উপাদানগুলিকে পরিধিতে রেখে। ঠিক এর উলটো দৃষ্টিভঙ্গিই হল ইকোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা 'কেন্দ্র' আর পরিধির উচ্চ-নীচ সম্পর্কটিকে ভেঙে ফেলে মানুষকে পরিবেশের আর পাঁচটা উপাদানের সঙ্গে এক করেই দেখে। (চক্রবর্তী : ২০১৪ : ৭১৫)

এই গল্পে উক্ত মানবকেন্দ্রিক (অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক) ধারণার ব্যত্যয় ঘটেছে পরিবেশের একদল পতঙ্গের আচরণে। প্রাসঙ্গিক গল্পাংশ এরকম –

> প্রথম যেদিন প্রজাপতিরা উঠে আসে, সেদিন কলোনির লোকেরা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, প্রজাপতিরা তাদের গৃহেই হয়তো থেকে যাবে; এবং ডিম পেড়ে তাদের সবুজ স্বপ্নের ভেতর সোনালি শুঁয়োপোকার রাজত্ব গড়ে তুলবে। কিন্তু তাদের ভয় সহসাই অপনোদিত হয়, প্রজাপতিরা মানুষের ঘরে থাকে না; বিকেলের আলো মরে যেতে থাকলে তারা চতুর্দিকে মিলিয়ে যায়। (জহির : ২০০৭ : ৫৭)

এখানে ইকোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করেছে। আবার যেদিন ভূমিকম্পে শহরের সাতাশটি দালানে ফাটল ধরে, একটি দালান কাত হয়ে যায়, আগারগাঁও কলোনির নয়নতারা গাছগুলো ভূপতিত হয় এবং দুটো নয়নতারা ফুলের টব দুহাতে তুলে নেয়ায় 'শরীরের ঊর্ধ্বাংশের ওজন বৃদ্ধি'র ফলে রেলিংয়ের ওপর আবদুস সাত্তারের ভারসাম্য নষ্ট হয়'। পরিণামে সে 'বোমারু বিমানের মতো একেবারে খাড়া' অবস্থায় পতিত হয় এবং তার খুলি থেঁতলে ও মগজ গলে মাটিতে মিশে যায়। তার দাফনের পর কলোনির লোকেরা ধরাশায়ী নয়নতারা গাছগুলোকে রেলিংয়ের ওপর তুলে দেয়। অতঃপর তাদের গাছগুলো সতেজ হয়। প্রজাপতিও ফিরে আসে। কিন্তু বিপত্তি ঘটে, যখন শিরীন বানু তার গাছগুলো মাটি থেকে তুলে এনে নতুন পটে লাগানোর পর সেগুলো দ্রুত মরে যেতে থাকে। পরবর্তী এক সপ্তাহের ভেতর কলোনির সতেজ হয়ে আসা অন্য নয়নতারা গাছগুলোও শুকিয়ে যায়। তারা নতুন চারা এনে লাগালেও গাছগুলোর একই পরিণতি ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় কৃষি কলেজের এক প্রবীণ অধ্যাপককে তারা অনুরোধ করে ডেকে আনে। এক মাসের কঠিন পরিশ্রমে তাঁর আবিষ্কৃত 'সত্য' তিনি বুঝিয়ে বলতে অপারগ হয়ে কলোনির লোকদের নয়নতারা গাছ না লাগানোর পরামর্শ দেন। উত্তর-আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে বিজ্ঞান ও আখ্যানের বৈরিতায় 'সত্য'-প্রতিষ্ঠার যে অনিচ্ছুক অধিগ্রহণ-পর্ব জারি থাকে,[১৭] প্রবীণ-অধ্যাপক এ-পর্বে সেই সমস্যায় নিপতিত হন। অবশেষে ব্যক্তিগত নোটবুকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিজাত যে কথাগুলো তিনি লেখেন, তার অংশবিশেষ–

> ...গরুর তাজা মস্তিষ্ক দিয়ে দেখেছি, এমনকি (খুব গোপনীয় কথা) কয়েক দিন আগে পলিথিনের ব্যাগে করে মেডিক্যাল কলেজের মর্গ থেকে মানুষের মগজ এনে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েও দেখেছি; কাজ হয়নি। চারাটি মরে যাচ্ছিল, অবশেষে সেটাকে অন্য তিনটির সঙ্গে লাগিয়ে দেয়ার পর আবার বেঁচে উঠেছে। এই একটি জায়গায় (পরীক্ষা করে এখানকার মাটির কোনো পৃথক বিশেষত্ব পাওয়া যায়নি) গাছগুলো কেন বেঁচে ওঠে তা আন্দাজ করা কঠিন, এই জায়গার শুধু একটিই বিশেষত্ব তা হচ্ছে এখানে একজন ব্যক্তির মাথা থেঁতলে যায়, যে ব্যক্তি, আমি শুনেছি, একটু পাগলাটে ছিল এবং ভূমিকম্পের সময় নয়নতারা গাছের দুটো টব বাঁচাতে গিয়ে নিজেও পড়ে যায়; তাহলে কি ব্যাপারটা

> এইসব গাছের ব্যক্তিগত কোনো বিষয়? হতে পারে। অন্তত এই কলোনির নয়নতারা গাছগুলোকে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে নিলে তারা যে মরে যায়, সে বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, গাছগুলো স্রেফ আত্মহত্যা করে। কারণ, তাদের মরে যাওয়ার কোনো বাস্তব কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এই নয়নতারা গাছগুলো কেন মরে যায়, সে সম্পর্কে এ ছাড়া অন্য কিছু আমি বলতে পারি না। আমি তো জানি, গাছেরা কেমন সংবেদনশীল প্রাণী। আর এ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার এই ইচ্ছে প্রথমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায় গাছগুলোর নৈকট্যের কারণে এবং প্রজাপতি সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় মেসেঞ্জারের কাজ করেছে; পরে, আমার সন্দেহ হয়, মাটিরও কোনো এক ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে। প্রজাপতির সংস্পর্শ এড়াতে পারলে এবং অন্য স্থান থেকে মাটি এনে গাছ লাগালে, আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল গাছ হয়তো আবার হবে। (জহির : ২০০৭ : ৬২-৬৩)

প্রবীণ অধ্যাপক গাছগুলোর 'স্রেফ আত্মহত্যা' করার যুৎসই কারণ খুঁজে না পেয়ে একে গাছেদের 'ব্যক্তিগত কোনো বিষয়' বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে উত্তর-আধুনিকবাদ সমাধানমুখী নয় – তর্ক-বিতর্ক ও ডিসকোর্স-অভিমুখী। তাই নয়নতারা গাছেদের 'আত্মহত্যা' বিষয়ে অন্তত তিনটি পাঠ নির্মাণ করা যায় –

১. গল্পকারের জাদুবাস্তববাদী নিরীক্ষা : মার্কেসের 'সরলা এরেন্দিরা ও তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনি' গল্পে উলিসিস এরেন্দিরার প্রেমে পড়ার পর কাঁচের বস্তু স্পর্শ করতেই নীল হয়ে যাচ্ছিল, তখনই তার মা বুঝতে পারে ছেলের প্রেমে পড়ার ব্যাপারটি; তেমনি নয়নতারা ফুলের দুটি টবকে রক্ষা করতে গিয়ে আবদুস সাত্তারের ভূপতিত হয়ে মৃত্যুর ফলে তার দেহান্তসার মিশ্রিত মাটি ছাড়া গাছগুলোর মরে যাওয়া বা আত্মহত্যার ব্যাপারটিও অধ্যাপকের মনে আসে। মূলগত দিক থেকে এই দুটি ব্যাপার আন্তঃসম্পর্কিত অর্থাৎ জাদুবাস্তববাদী।

২. সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টান্ত : গাছেদের অনুভব-অনুভূতি এই-অংশে প্রকাশিত। অধ্যাপক লিখেছেন – 'আমি তো জানি, গাছেরা কেমন সংবেদনশীল প্রাণী।' গাছের সংবেদনশীলতার উল্লেখ আদিম মানুষ ও আদিবাসীদের বিশ্বাসজাত হয়ে বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষের ধারণায় অন্তঃপ্রবিষ্ট ব্যাপার।[১৮]

৩. ইকোক্রিটিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার : গাছেদের 'ব্যক্তিগত বিষয়', 'সংবেদনশীলতা', 'আত্মহত্যা', প্রজাপতির মেসেঞ্জারের ভূমিকা পালন প্রভৃতি মানবকেন্দ্রিক ধারণার উল্টোদিকের ব্যাপারাদি। অর্থাৎ এসব বিষয় ইকোসেন্ট্রিক ধারণার বহিঃপ্রকাশক।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' ফেবুলেটেড জাদুবাস্তববাদী গল্প, যার অন্তর্ভাষ্যে রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্যের চোরাস্রোত। যেমন – ক. গ্রামীণ ভূমিহীন পেশাজীবী মানুষের উন্মূল হয়ে শহরে বস্তিবাসী হওয়া : কাঠুরে আকালুর বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম ছেড়ে দয়াগঞ্জ বস্তির ঝুপড়িতে বাস; খ. শিক্ষিত আইনজীবী ও চতুর মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রলোভন ও শোষণে দরিদ্রের সন্ত্রস্ত হওয়া: গাছের ফোকরে প্রাপ্ত টাকার ভাগাভাগিতে নিঃস্ব ও ত্রস্ত আকালু-টেপির রাতের অন্ধকারে গ্রামত্যাগ; গ. আইনের রক্ষকদের দুর্বৃত্তায়নে সৎ ও সরল মানুষের হয়রানি ও শাস্তি : রিক্সাযাত্রীর ফেলে যাওয়া মানিব্যাগের টাকা ফেরতপ্রদান ও জেলখানার ভেতর সোনার আংটিকেন্দ্রিক ঘটনাদ্বয়ের পরবর্তী সময়ে পুলিশ কর্তৃক আকালুর নাজেহাল অবস্থা; ঘ. মানুষের লোভ ও ঈর্ষাকাতর আচরণে দরিদ্রের নির্বিঘ্ন জীবনের শান্তি নস্যাৎ হওয়া : কাকদের সহায়তায় জেলার সাহেবের নয়াটোলার বস্তিতে আকালু-টেপির সুখী সংসারে মহল্লার লোকদের মাসব্যাপী অবরোধ ও উপদ্রব এবং পরিণামে তাদের অন্তর্ধান ইত্যাদি।

উপকথার পাখিদের মত এই গল্পে কাক সহজ-সরল আকালু-টেপির জন্য উপকারী, সম্পদ-অর্থ সরবরাহকারী। নিঃসন্তান টেপি কাকদের ভাষা বোঝে। আকালু লোকসংস্কার অনুযায়ী কাকদের মনে

করে দুর্ভাগ্য ও সমস্যা সৃষ্টিকারী। এভাবে মানুষ-পাখিতে মিলে যে দরদ ও নির্ভরতার গল্প বিশ্বাস-অবিশ্বাসে প্রাচীনেরা লালন করতো, অবশেষে সেসব গল্পের অবসান হয় মনুষ্য-উপদ্রবে কাক-পরিবেষ্টিত হয়ে আকালু-টেপির নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্য দিয়ে। কেবল আকালু-টেপি নয়, ঢাকা শহরের প্রবীণ অধিবাসীদের স্মরণে আসে, বহুদিন পূর্বে ঢাকা শহর এই ঘটনার জেরে কাকশূন্য হয়ে পড়েছিল। লোকশ্রুতিতে নয়াটোলায় যে কাহিনি এ-সম্পর্কে প্রচার পায়, তা স্পষ্টতই জাদুবাস্তববাদী –

> ...আসলে ওই কাকেরা তাদের বাঁশের আড়া ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকালু এবং টেপিকে ঠোঁটে করে নিয়ে যায়। মহল্লার লোকেরা এই কথা বলে যে, যে রাতে আকালুর বাসায় বাঁশের আড়ার কাকেরা আগুনের তাপ আর ধোঁয়া সহ্য করতে না পেরে উড়ে যায়, সে রাতে, তখন রামপুরা ঝিলের কিনারায় কিছু লোক নৌকা বেঁধে পাটাতনের ওপর শুয়ে ছিল। যখন নৌকার মাঝিরা নৌকার পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে বিড়ি ফুঁকে গল্প করছিল তখন তারা একসময় দেখে যে, সহস্র করতালির মতো পাখার আওয়াজ তুলে বিশাল একঝাঁক পাখি উড়ে যায়। তারা দেখে যে, এই উড়ন্ত পাখিতে আকাশের চতুর্দিক প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে; চিৎ হয়ে শুয়ে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তারা দেখতে পায় যে, একটি বা দুটি জায়গায় পাখিরা যেন পিঁপড়েদের মতো দলা বেঁধে আছে; কিন্তু তারপর তারা বুঝতে পারে যে, আসলে একটি জায়গায় বেশি পাখি জড়ো হয়ে যায়নি, বরং পাখিরা কি যেন মুখে করে শূন্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রথমে তাদের কাছে মনে হয় যেন দুটো কাপড়ের টুকরো, কিন্তু তারপর পশ্চাৎপটে আকাশের আবছা আলোয় উড়ন্ত পাখিদের ভিড়ে তারা দুটো মানুষের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখে। এই কালো পাখিরা রামপুরার ঝিলের ওপর দিয়ে ধলেশ্বরীর কুয়াশার ভেতর উড়ে যায়। (জহির : ২০০৭ : ৮১-৮২)

মার্কেসের উপন্যাসের সুন্দরী মার্সেদিসের অন্তর্ধানের সঙ্গে এই বর্ণনাংশের দূরতর সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। উপকথার আদল ব্যবহার করে ঢাকা শহরের কাক ও মানুষের কাহিনি রচনা করতে গিয়ে স্পষ্টতই গল্পকার ফেবুলেশনের[১৯] আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় গল্প 'ডুমুরখেকো মানুষ'-এর শেষে ডুমুরখেকো কয়েকজন মানুষ মোহাব্বত আলি জাদুগিরের বাসগৃহে হানা দিয়ে মারমুখো হবার পর তাদের পরিণতি বর্ণিত হয় এভাবে –

> ...শনিবারের দুপুরবেলা রক্তচক্ষু এবং কম্পিত দেহে পৃথিবীকে পিছনে রেখে তারা তাদের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় গিয়ে শোয় এবং প্রবল তাপ ও শারীরিক বিক্ষেপের কারণে তাদের গৃহের লোকেরা তাদের দেহ চাদরে ঢেকে দেয়। তারপর...চাদরের নিচে কোনো মানুষের অবয়ব দেখে না। তারা এ সময় ভাবে যে, লোকটি বোধহয় বাথরুমে গেছে, কিন্তু তারা বাথরুমে তাকে খুঁজে পায় না; এবং তখন, সারা বাড়ির কোথাও এই লোকটিকে, যে লোকটি কিছুদিন হয় জগডুমুর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল, খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ছড়িয়ে থাকা চাদরটি ওঠায় এবং লক্ষ্মীবাজারে অথবা নারিন্দায়, দয়াগঞ্জে অথবা বনগ্রামে পাঁচটি বাড়িতে বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখে। তখন এইসব মহল্লার লোকেরা ডুমুর ভক্ষণকারী এইসব লোকেরা কথা বলে, তারা তাদের ডুমুর খাওয়ার আনন্দ এবং বেদনার কথা বলে, এবং তারা তাদের অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে। (জহির : ২০০৭ : ৯২)

পুঁজিবাদী সভ্যতায় ভোগবাদী সংস্কৃতির বিলাসী পণ্যের প্রতীক যেন ডুমুর। এর ভক্ষণবাসনা পূরণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ভোগবাদী মানুষ। এর বিপণন-ব্যবস্থা ও মূল্য-বৃদ্ধির প্রক্রিয়া পণ্য-সংস্কৃতির প্রক্রিয়াকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভাব্য ক্রেতাকে কীভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে হয় তা মোহাব্বত আলির চমকপ্রদ উপস্থাপনে দেখা যায়। অল্প দামে প্রথমে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদার সৃষ্টি হয়, এরপর চাহিদার দুষ্টচক্র থেকে বের না হতে পারার পরিণতিসূত্রে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করা পুঁজিবাদী সিস্টেমের প্রামাণ্য ছক। ষষ্ঠবারের মত ডুমুর কেনার লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায় তাই আবদুল গফুরকে। প্রাসঙ্গিক গল্পাংশ –

> ...পঞ্চমবার সে যখন ডুমুর কিনেছিল তখন দুটি ডুমুরের দাম পড়েছিল বত্রিশ টাকা, এইদিন ষষ্ঠবারের মতো তার হাতে পলিথিনের ব্যাগে জড়ানো দুটি ডুমুর তুলে দিয়ে মোহাব্বত আলি যখন ডুমুরের মূল্যবাবদ চৌষট্টি টাকা দাবি করে, আবদুল গফুর অস্পষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে এবং সে ডুমুর না কিনেই ঘরে ফিরে যায়। (জহির : ২০০৭ : ৯০)

ক্রমে গল্পে পাঁচজন ডুমুরখেকোকে এক হতে দেখা যায়। তারা জাদুগিরের নির্দেশ অমান্য করে প্রাসাদের সিংহদরজা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং জাদুগিরের কাছে প্রস্তাব দেয় ডুমুর গাছ কেনার জন্য। কিন্তু পুঁজিবাদী পণ্যসংস্কৃতি যেমন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বাজার-চাহিদার তুলনায় কম দ্রব্যের যোগান দেয়, তেমনি জাদুগিরও গাছ বিক্রয়ে অনীহা প্রকাশ করে। চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়হীনতার কারণে সমাজজীবনে যে অস্থিতিশীলতা ও সংঘাত সৃষ্টি হয়, পাঁচজন ডুমুরখেকো ও জাদুগিরের পরিণাম-নির্দেশক আচরণসমূহে তা-ই স্পষ্টতা পায়। বদ্রিলার তাঁর 'সিমুলেশন' গ্রন্থে এরই বিশদ তত্ত্বীয় আলাপ উত্থাপন করেছিলেন। জাদু, রূপকথা প্রভৃতির সাহায্যে এই গল্পের ফেবুলেশন ঘটেছে। গল্পকারের উত্তর-আধুনিক নিরীক্ষার আরেকটি দৃষ্টান্ত এই গল্পে মেটাফিকশনিস্ট[২০] উপাদানের ব্যবহার। গল্পের পাঁচজন ডুমুরখেকোর মধ্যে একজনের নাম শহীদুল হক। উল্লেখ্য লেখক শহীদুল জহিরের কাগুজে নাম শহীদুল হক। পণ্যায়িত সভ্যতার কিংবা ভোগবাদী সমাজের অংশ তৃতীয় বিশ্বের অল্পসামর্থ্যের নাগরিকগণও – সে হিসেবে স্বয়ং লেখকও। তাই এই অবস্থানকে বিস্মৃত না হয়ে বরং সচেতনভাবে তার উপস্থাপন ঘটিয়েছেন তিনি। এই গল্পে হাইপাররিয়েলিটি[২১] লক্ষণীয় জাদুকরের 'হাড়ের যষ্ঠি থেকে উত্থিত উদ্ভিন্ন বণিতা' যুবতী প্রীতিলতার উপস্থাপনে। এই উপস্থাপনের ভাষা ও দৃশ্য বিজ্ঞাপনের মতোই – দৃশ্যমান বাস্তবের চেয়ে অধিক বাস্তব।

'এই সময়' গল্পটি সমকালীন দুর্বৃত্তায়নের এক খতিয়ান। ভ্রষ্ট সমাজে কীভাবে শুভ ও সুন্দরের দমন ঘটে, ভূতের গলির ভজহরি সাহা স্ট্রিটের লোকদের যাপন-অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। ক্ষমতা ও যৌনতার বিধ্বংসী রূপকল্পও এই গল্প। প্রায়-জন্মক্ষণেই পিতৃমাতৃহীন ষোড়শবর্ষীয় তরুণ মোহাম্মদ সেলিমকে হত্যা, সন্ত্রস্ত মহল্লাবাসীর সব জেনেও পুলিশকে কিছু বলতে না পারা, অকাল-বিধবা শিরীন আকতারকে জোরপূর্বক আবু হোসেনের বিয়ে প্রভৃতি ঘটনায় দাপুটে দুর্বৃত্ত ভ্রাতৃত্রয় – আবু, হাবু ও শফি। মহল্লার শিল্পপতি (এরশাদ সাহেব), ধর্মীয় নেতা (মাওলানা আবদুল জব্বার), ব্যবসায়ী (মরহুম ইয়াসিন ব্যাপারির স্ত্রী মালেকা বানু), রাজনৈতিক নেতা (মেজর ইলিয়াস) সবাই তাদের হাঁচি-সমস্যা (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যা) সমাধানের জন্যও উক্ত ভ্রাতৃত্রয়কে পর্যায়ক্রমে ডেকে পাঠায়। গল্পের এই অংশ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, উক্ত ভ্রাতৃত্রয় এই সময় ও এই সমাজে উদ্ভূত সব সমস্যা সমাধানে অবিকল্প শক্তিরূপে বিবেচিত। অথচ, তারা সন্ত্রাসী বৈ আর কিছু নয়। অর্থাৎ ব্যবসা, ধর্ম, রাজনীতি – সব ক্ষেত্রেই যখন ছিল সন্ত্রাসীরা অপরিহার্য, তেমন এক সময়ের কথাই এই গল্পে বিবৃত। তাদের পেশীশক্তির কাছে সবাই পরাস্ত। তাই আজিজ ব্যাপারির বিধবা সুন্দরী মেয়ের প্রতি মহল্লার পেশা-বয়স নির্বিশেষে বহু পুরুষ আকৃষ্ট হলেও জবরদস্তিমূলকভাবে ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যেষ্ঠজন তাকে বিয়ে করে। কেবল যৌনতা ও ক্ষমতা নয়, যখন তিন ভাই এরশাদ সাহেবের বাসায় যায়, তার পূর্বমুহূর্তের বর্ণনা লক্ষ করলে উত্তর-আধুনিকবাদী তত্ত্বের আরেক বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয় –

> চাকরেরা দিনের যখনই তিন ভাইয়ের বাসায় আসে তারা তাদেরকে ভিসিআরে হিন্দি ফিল্ম দেখায় ব্যস্ত দেখতে পায়। আবু, হাবু এবং শফি এইসব লোকের ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়, তারপর তারা জিনসের প্যান্টের ওপর গেঞ্জি পরে গলায় লকেটসহ সোনার চেন ঝুলিয়ে এরশাদ সাহেবের বাসায় যায়। (জহির : ২০০৭ : ৯৬)

এই বর্ণনাংশে তত্ত্বীয়ভাবে সিমুলাক্রার-র প্রায়োগিক দৃশ্যপট রচিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিন্দি ফিল্ম' দেখা ও 'জিন্সের প্যান্টের ওপর গেঞ্জি' পরার উল্লেখে গল্পকার পরিবর্তিত সময়ের পরিবর্তিত সংস্কৃতির রূপ তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থের প্রথম গল্পের আলোচনার এক পর্যায়ে আলোচ্য গল্পের মধ্যেও ইকোক্রিটিসিজমের প্রভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছিল; এবার দেখে নেয়া যাক এর ধরন। আগেই বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে পরিবেশের ওপর এর নেতিপ্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বের উদ্ভব। 'এই সময়' গল্পে আপাতভাবে মহল্লার অনেকের হাঁচি রোগ এবং প্রচলিত ঔষধে তার নিরাময় না হওয়ার বিষয়টিকে অ্যাবসার্ড মনে হতে পারে। ডাক্তারের জ্ঞানসীমা-অনুযায়ী যে যে কারণে এমন হতে পারে তার মধ্যে একটি 'ফুলের রেণু'। তাই এর প্রতিকার হিসেবে 'মোহাম্মদ সেলিমের ফুলের বাগানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত' হয়েছিল। কিন্তু এই হাঁচির উৎস ছিলো অন্যত্র। গল্পকার জানান–

> ...মহল্লার লোকেরা তখন জানতে পারে যে, এই এক মাস যখন তারা বিরক্তিকর হাঁচিতে আক্রান্ত হয়েছিল তখন মহল্লার বাতাস উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসে এবং একই সময়ে হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির বার্নারে গোলযোগ দেখা দেয়। বার্নারের গোলযোগের কারণে চোঙার ভেতর দিয়ে নির্গত কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুপ্রবাহ এই ধোঁয়া ফ্যাক্টরির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মহল্লার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। ভূতের গলির ওপর আসতে আসতে ধোঁয়ার রং হালকা হয়ে আসে, গন্ধও থাকে না, কিন্তু বাতাসে এর ক্রমাগত উপস্থিতির কারণে ভূতের গলির লোকদের নাকে হালকা প্রদাহ জিইয়ে থাকে। এক মাস পর এই বাতাস পড়ে এলে মহল্লার লোকদের হাঁচি দেয়া থামে...। (জহির : ২০০৭ : ৯৮)

গ্লাস ফ্যাক্টরির বার্নারের গোলযোগ ও তাতে মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি – এসব বিষয় স্পষ্টতই ইকোক্রিটিকদের আন্দোলনের প্রাথমিক ও মূল বক্তব্যের অনুগামী।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূতের গলির বাসিন্দাদের উৎকণ্ঠা, পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর-কর্তৃক হত্যা-নিপীড়ন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সংঘটিত দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু-নিপীড়নের পটভূমিতে রচিত গল্প 'কাঁটা'। ভূতের গলির লোকদের সন্দেহ হয়, 'তারা সময়ের একটি চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে গেছে' এবং 'তাদের জীবনে সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, বর্তমান অতীতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অথবা অতীত, বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।' (জহির : ২০০৭ : ১০৮) তাদের জীবনে সময়ের এমন ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে পুনরাবৃত্ত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি হলো – আবদুল আজিজ ব্যাপারির ভাড়াটে সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির কুয়োতে পড়ে মৃত্যু বা হত্যা কিংবা আত্মহত্যা। গল্পে তিনবার অভিন্ন স্থানে তিনটি পৃথক সময়ে এই ঘটনাটি ঘটে – উনিশশো একাত্তর সনে মুক্তিযুদ্ধকালে, আশির দশকে দ্বিতীয় সামরিক শাসনের কালে উদ্ভূত দাঙ্গার সময়ে এবং ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে। ভূতের গলির বাসিন্দারা প্রথমবার এই ঘটনার সংঘটনকালে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও ভূমিকার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তারপরও দুবার এই ঘটনার অমোঘতা তারা ফেরাতে পারে না। বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতকে মহল্লাবাসী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তবে শেষবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর তারা আজিজ ব্যাপারির বাড়ির কুয়োটি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু সুবোধচন্দ্রের বিষয়ে বাড়িওয়ালার বিস্ময় প্রকাশে তাদের বিভ্রান্তি জাগে এবং ধারণা হয় –

> তারা হয়তো কোনো এক জায়গায় কোনো এক স্বপ্নের ভেতর আটকা পড়ে আছে এবং এই স্বপ্নের ভেতর তারা অতীত থেকে ভবিষ্যতে অথবা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং তাদের মনে হয় যে, সুবোধ ও স্বপ্নের বিষয়টি হয়তো সত্য নয়, স্বপ্ন; (জহির : ২০০৭ : ১২৭)

এরপর তাদের স্বপ্নার লাগানো তুলসী গাছটির কথা মনে পড়ে, এবং তারা 'দেয়ালের কিনারায় মৃদু বাতাসের ভেতর তুলসী গাছটিকে দেখে; এবং তখন তাদের কুয়োটির কথা মনে পড়ে।' (জহির : ২০০৭ : ১২৭) এভাবে বিশ শতকের আশির দশকে শুরু হওয়া গল্পটির ঘটনা ও এর রেশ থাকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে, এমনকি ভূতের গলির বাসিন্দাদের স্বপ্ন ও বিভ্রমেও, পাঠকেরও। মহল্লার

বাসিন্দাদের 'জীবনের সময়ের কাঠামোটি ভেঙে' পড়ার প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরোক্ষে গল্পকার গল্পের সময়ের কাঠামোও কার্যত এভাবেই ভেঙে দেন – আর এতে উত্তর-আধুনিকবাদী ছোটগল্পের নির্মাণশৈলীই পাঠক আবিষ্কার করে। ভিন্ন চেহারার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পরিণতিসম্পন্ন স্বপ্না-সুবোধ মুক্তিযুদ্ধকালীন ও স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মীয় ইস্যুতে নিপীড়িত অসংখ্য সংখ্যালঘুর জীবন ও মৃত্যুর প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র। এই দম্পতিকে মহল্লাবাসীর অভয়বাণী – 'ডরাবেন না'; কিন্তু তা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। কারণ যে বৃহৎ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শক্তি এর পেছনে ক্রিয়মাণ, তা প্রতিহত করার ক্ষমতা মহল্লাবাসীর নেই। দলয়জ ও গাত্তারি এমন বিষয়কেই দেখেছিলেন রাইজোমিক[২২] হিসেবে। সুবোধ-স্বপ্নার মৃত্যু বা হত্যার পেছনে যে গভীর বিষয় এদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উপরিকাঠামোর ভেতর প্রকট আকার নিয়ে বিরাজমান, তাকে সহসা আবিষ্কার করা যায় না। তাই গুটিকয় মানুষের অভয়বাণী ও সহযোগী মনোভাব এর অমোঘতাকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়। এই গল্পে মহল্লায় সুবোধ-স্বপ্নার বাস, তাদের আতেথেয়তা, কর্মপ্রক্রিয়া, পরিচিতি ও পরিণতির পূর্বানুমিত রূপের বয়ন নির্মিত হয় জাদুবাস্তববাদের প্রয়োগে। আর এতে গল্পকার উপাদান-আবহ সংগ্রহ করেন এদেশের সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা জনযাপন থেকে, যেমনভাবে ল্যাতিন সাহিত্যিকগণ তা গ্রহণ করেন ল্যাতিন পরিমণ্ডল থেকে।

উত্তর-আধুনিকবাদের নানা অনুষঙ্গের মিথস্ক্রিয়ায় 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' জটিল এক গল্প। এই গল্পের আলোচনা পরবর্তী গ্রন্থের গল্পগুলোর সঙ্গে করা হবে।[২৩]

নকশাল আন্দোলনের[২৪] এক কর্মী আবদুল ওয়াহিদের উত্তরবঙ্গের নিজ গ্রাম সুহাসিনীতে প্রত্যাবর্তন এবং বছর না পেরোতেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসাগত কারণে খুন হবার পটভূমিতে রচিত গল্প 'ধুলোর দিনে ফেরা'। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া শহীদুল জহিরের রচনায় রাজনৈতিক ঘটনাকেন্দ্রিকতা বিরল, এই গল্পটি তাই ব্যতিক্রমধর্মী। প্রচলিত রাজনৈতিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক এই আন্দোলন ছিল প্রান্তিক জনতার পক্ষের। তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-আধুনিকবাদ বিশালের বিপক্ষ ও ক্ষুদ্রের পক্ষাবলম্বী। গ্রামবাসীর স্মৃতি-অনুযায়ী–

> ...মুক্তিযুদ্ধের বছরের আগে, আবদুল ওয়াহিদ সিরাজগঞ্জ কলেজ থেকে বিএ পাস করে ঢাকা যায় পড়ার জন্য এবং তার পর কোনো খবর পাওয়া যায় না। এরপর গ্রামের লোকেরা আবদুল ওয়াহিদের কথা ভুলে যায় এবং কত বছর পর তা তারা বলতে পারে না। একদিন তারা নকশালদের কথা শুনতে পায় এবং জানতে পারে যে, নলকা এলাকায় নকশালরা একটা ঘাঁটি বানিয়েছে, এই দলে আছে আবদুল করিম মিয়ার ছেলে আবদুল ওয়াহিদ। (জহির : ২০০৭ : ১৪৭)

একুশ বছর পর অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকের গোড়াতে নকশালবাদী এই চরিত্রের গ্রামে প্রত্যাবর্তনের যে কারণ গল্পে ধৃত হয়েছে, সে-সূত্রে একে রাজনৈতিকভাবে পাঠের পাশাপাশি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) *বনলতা সেন* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের 'দুজন' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু এর ইন্টারটেক্সচুয়াল পাঠ নির্মাণ করা যায়। আবদুল ওয়াহিদের গ্রামে ফেরা বিষয়ে গল্পের বর্ণানাংশ –

> ...সুহসিনীর লোকদের বিভ্রান্তি হয়, তাদের মনে হয় যে, জীবনের এই পর্যায়ে আবদুল ওয়াহিদের কি খুব বেশি মনে পড়েছিল চপল বালিকার কথা, গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে যাকে সে ময়না পাখি বলে শালিক দিয়ে ঠকায় এবং একুশ বছর পর গ্রামে পুনরায় ফিরে আবিষ্কার করে বালিকা কেমন করে নারী হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকদের খুবই বিভ্রান্তি হয়; তারা বলে, এই নারীর জন্যই হয়তো বা আবদুল ওয়াহিদ মারা যায়। যদিও তারা জানে যে, মরার জন্যই সে ধুলোর ভেতর দিয়ে গ্রামে ফিরেছিল, কারণ তার নিদ্রাহীনতা দেখা দিয়েছিল। (জহির : ২০০৭ : ১৫৭)

নূরজাহানের 'বালিকা' থেকে 'নারী' হয়ে ওঠা আবদুল ওয়াহিদের যখন চোখে পড়ে, তখন সে তার কৈশোর প্রণয়িনীর অনাত্মীয়, তারই বাল্যবন্ধু আবুল হোসেনের পত্নী। ফেরার পর প্রথম বন্ধুর বাড়িতে

গেলে তাকে পান বানিয়ে দেয় নূরজাহান, আর বন্ধুর আপাত-দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা 'লাভ কি হইলো'-র পেছনে থাকে ওয়াহিদের রাজনীতি ও না-সংসারী জীবনের ব্যর্থ-ইতিবৃত্ত। সেদিন ওয়াহিদের কিছু না বলা ও মুখে নীরব হাসি নিয়ে চুপ করে থাকায় নূরজাহান বিচলিত হয়। তারপর সে 'মধ্যবয়স্কা গ্রাম্য সুন্দরী নারীর চোখের দিকে তাকায়' এবং বিড়বিড় করে বলে 'কি আর লাভ হইব।' ভিন্ন এই বাস্তবতা পুরনো প্রণয়িনীর সংসারে আগন্তুকরূপী ওয়াহিদের মনে যেন কবিতার সেইসব পঙ্‌ক্তিরই পুনরাবৃত্তি ঘটায় –

আমাকে খোঁজো না তুমি – বহুদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো; – এক নক্ষত্রের নিচে তবু – একই আলোপৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রের একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি? (দাশ : ২০১৬ : ১৬৫)

সমাজ-সংসার ও সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অন্ধকারে তাদের এই চেতনা যৌথ হয়েও বিচ্ছিন্ন, তাই একজনের 'সংসার' আর আরেকজনের 'রাজনীতি'– এই ভিন্ন পথে তাদের খুঁজতে হয় সান্ত্বনা। কুড়ি বছর বা তারও আগে যখন কিশোরী নূরজাহানকে ওয়াহিদ ময়না পাখি দেবার কথা বলে শালিক দিয়ে যায় এবং শালিককে কথা শেখাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাকে তিন বছর ধরে এক ক্লাসে পড়তে হয়, তখন এই 'ঘোরলাগা' কিশোরীকে বিয়ে করে আবুল হোসেন। তাদের জীবনের এই অংশও যেন আলোচ্য কবিতা থেকেই উদ্ধৃত –

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন;... (দাশ : ২০১৬ : ১৬৫)

'ময়না' বলে শালিক দেবার ঘটনায় নূরজাহান কষ্ট পেয়েছিল, তার সেই কষ্টজাত ক্রোধ প্রত্যাবর্তিত ওয়াহেদকে এ-বিষয়ক প্রশ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। কয়েকবছর কথা না-বলা পাখিকে কথা শেখানোর চেষ্টার প্রতীকতায় তাদের সম্পর্কের যে রূপ ফুটে ওঠে কবিতায় 'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে'তে তারই আভাস পাওয়া যায় – তাই তার হৃদয় যে আশ্বাস অবলম্বন করতে চেয়েছে তখন, তা বাস্তবায়িত হয়েছে আবুল হোসেনের উদ্যোগে। 'সময়ের দায়ভাগী' হিসেবে তাই আজ ওয়াহেদ-নূরজাহান এই দুই নর-নারী 'পুরানো পথের রেখা' বেয়ে মুখোমুখি। এই গল্পে 'দুজন' কবিতার যে চিত্রকল্পের প্রায়-হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান পাঠকে আরও প্রাসঙ্গিক করে, তা শালিকের মৃত্যুদৃশ্য ও এর পটভূমি। কবিতায় শালিকের মুমূর্ষু অবস্থার কথা বলে কবি জানিয়েছিলেন– 'হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে;/ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।' (দাশ : ২০১৬ : ১৬৫) আর এই গল্পের কথা না-বলা শালিক বিয়ের আয়োজনের মধ্যে ব্যস্ত কনের মনোযোগহীনতার মধ্যে মরে যায়। আর এদের কথা কনের মনে পড়লে নূরজাহান ছুটে আসে বাপের বাড়ি, আর– 'মাচার ওপর থেকে যখন খাঁচা নামায় তখন আকাশের দিকে দুই পা তুলে চিৎ হয়ে থাকা পাখিটাকে দেখতে পায়।' (জহির : ২০০৭ : ১৫৩) এভাবেই একদিন যে সম্ভাবনাময় সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল একুশ বছর পর তা বিষাদ নিয়ে আবির্ভূত হয়। পুনরায় ওয়াহিদ একজোড়া পাখি কিনে আনে। তবে এবার শালিক নয়, আনে ময়না। পৃথক খাঁচায় রাখে – ঠিক যেমনটি সে ও তার পূর্ব-প্রণয়িনী রয়েছে। তাদেরকে কথা শেখায়, হয়তো শেখায় না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর নূরজাহান যখন আবার খাঁচাসমেত পাখিদুটো নিয়ে আসে তখন পৃথক খাঁচা থেকে এদের একটি বলে – 'কান্দেন ক্যা?' আর অপরটি উত্তর দেয় – 'সুখ নাই জীবনে।' এভাবে দুই নর-নারীর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখবোধ পাখির ভাষায় গল্পে হাজির হয়। কেবল

দুই মানব-মানবী নয় এক খাঁচায় থাকলে কথা না বলা, কিন্তু পৃথক খাঁচায় থাকলে এমন আলাপে গল্পকার মানবহৃদয়ের প্রাপ্তির নীরবতা ও অপ্রাপ্তির কষ্টের পাশাপাশি পৃথিবীর অসুখী মানুষের রূপদর্শন করান। 'শ্রেণিশত্রু খতম' করে মানুষকে সুখী করার চেষ্টায় নিরত ওয়াহিদ শেষপর্যন্ত অসুখী মন আর নিদ্রাহীনতা নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। একটি সম্পর্কের অপমৃত্যু ঘটেছে তার রাজনৈতিক স্বপ্নের বাস্তবায়নে। এদিকে প্রেম বা হৃদ্যতার শেষ চিহ্নকে বাঁচাতে তৎপর নূরজাহান নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সুখী হয়নি। তার রয়ে যাওয়া পিছুটান ওয়াহিদ আবিষ্কার করেছে, গল্পের পাঠককুলও। তাদের স্বপ্ন কিংবা জীবনের নির্মাণ-পুনঃনির্মাণের পথে যে আক্ষেপ তাদেরকে অসুখী রেখেছে, কবিতায় তারই বিন্যাস এমন –

> ...পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
> জানি আমি; – তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
> কী নিয়ে থাকিবে বলো; – একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা
> তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
> হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের – প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
> ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে – (দাশ : ২০১৬ : ১৬৫)

ঘটনা ও সময়ক্রমের বিন্যাসকে ওলট-পালট করে দিয়ে যে বর্ণনাভঙ্গি জহির অনুসরণ করেন, এই গল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আন্তর্গ্রন্থিক এই বিষয়টি এ গল্পের নির্মাণে বিশেষ-বিবেচ্য হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহ। জহিরের বহুচর্চিত জাদুবাস্তবতারও প্রয়োগ এই গল্পে ঘটেছে আমিনুদ্দিনের লাল ফুলের গোলাপ গাছের ঘটনায়। একইসঙ্গে সর্বপ্রাণবাদের দৃষ্টান্ত মেলে 'গাছের অন্তরসত্তার ভেতর মানুষের কথার শব্দ শোনার নেশা', 'গাছের তন্তুর ভেতর বহুদিন পূর্বেকার স্মৃতি জেগে' ওঠার ঘটনা, আবদুল ওয়াহিদের 'কাচারিঘরের পিছনে পুঁতে দেয়া গোলাপের ডালটির সঙ্গে' নিম্নস্বরে কথা বলা কিংবা আমিনুদ্দিনের 'বিড়াল মিনির সঙ্গে কথা' বলার ঘটনাসমূহে।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'চতুর্থ মাত্রা'। বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'চতুর্থ মাত্রা'র মানে সময়। এই গল্পে বৈজ্ঞানিক সময়যন্ত্র অর্থাৎ 'ঘড়ির' চক্র ও আবদুল করিমের প্রাত্যহিক যাপনচক্রের এক পরীক্ষণ লক্ষ করা যায়। যেমনটি থমাস পিঞ্চন তাঁর 'এনট্রপি' গল্পে করেছিলেন। ঘড়ির কাঁটা যেমন সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা-আকারে পুনরাবর্তিত হয়, আবদুল করিমের যাপনও তেমনি। নির্দিষ্ট সময়ের কাঁটায় পৌঁছুলে ঘড়িতে যেমন বিশেষভাবে বিন্যস্ত ধ্বনি শোনা যায় আবদুল করিমের তিনবার করে কাশি বা নিদ্রা বা স্বপ্ন সে-রকমই যেন এই গল্পে। 'চতুর্থ মাত্রা'য় সময়-নির্দেশক যন্ত্রের উল্লেখ ও কার্যের পাশাপাশি ঘটনা সংস্থাপন ও পুনরাবৃত্তির যান্ত্রিকতা তৈরি করতে চেয়েছেন গল্পকার। ঘড়ির সময়ের কাঁটা যেভাবে অগ্রসর হয় তারিখের হিসেব শুধু তাতে পাল্টায়, কিন্তু তারিখ এতে যেমন দুর্লক্ষ্য তেমনি আবদুল করিমের জীবনের রুটিন-পরিবর্তনও প্রায় দুর্লক্ষ্য। গল্পের আখ্যানভাগকে প্রায় অগ্রসর না করে এমন গল্প-সৃষ্টি উত্তর-আধুনিক নিরীক্ষারই দৃষ্টান্ত।

গল্পের বিন্যাসে লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীদের তৃতীয় বন্ধনী-বদ্ধ বক্তব্য ও চরিত্রসমূহের সংলাপধর্মী বক্তব্য। এই সংলাপ দেখা যায় 'আবদুল করিম ও হকার', 'আবদুল করিম ও বালকসমূহ', 'আবদুল করিম ও পেপারওয়ালা', 'আবদুল করিম ও বুয়া', 'আবদুল করিম ও মহল্লার বাসিন্দা' 'আবদুল করিম ও আগন্তুক', 'আবদুল করিম ও তরুণী' প্রভৃতির মধ্যে। সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীগণ আবদুল করিমের পুনরাবৃত্ত এই সার্কেল এমনভাবে দেখে, যেমন কেউ ঘড়িতে সময় দেখে। প্রায় কিছুই না ঘটা এই গল্প পাঠককে মনে করিয়ে দেয় উত্তর-আধুনিকবাদী সাহিত্যের অন্যতম রূপকার স্যামুয়েল ব্যাকেটকে[২৫], তাঁর অনুসৃত অ্যাবসার্ডিজমকে।

ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প

শহীদুল জহিরের গল্পগ্রন্থগুলোর পাঠে দেখা যায়, তিনটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির বিষয় প্রাকরণিক নিরীক্ষার বিস্তৃতি; দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টির ব্যাপক বিস্তৃতি। তৃতীয় অর্থাৎ *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪) গ্রন্থের স্থানিক পটভূমি বিস্তৃত পুরান ঢাকার বিভিন্ন গলি-মহল্লায়, ময়মনসিংহ-ফুলবাড়িয়ায়, সুহাসিনীতে, চট্টগ্রাম ও সাতকানিয়ায়। আর এর বিষয়-পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো – মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধস্মৃতি এবং এর ক্রম অপসৃয়মান চেতনা, সাধারণের টিকে থাকার লড়াই বনাম আধিপত্যবাদ প্রভৃতি। উত্তর-আধুনিকবাদী নিরীক্ষার পরিণত দৃষ্টান্ত গল্পকারের এই গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো।

এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'কোথায় পাব তারে'। এটি পাঠ করা যায় কাব্যধর্মিতার ভিত্তিতে, পুরান ঢাকার সংস্কৃতির আওতায়, আর্থিক-মানসিক অসঙ্গতিজাত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এবং অ্যাবসার্ডিজমের আলোকে। গল্পটির শুরু তিন লাইনের এক অসম্পূর্ণ বাক্যে –

> দক্ষিণ মৈশুন্দি, ভূতের গলির লোকেরা পুনরায় এক জটিলতার ভেতর পড়ে এবং জোড়াপুল ও পদ্মনিধি লেনের, ওয়ারি ও বনগ্রামের, নারিন্দা ও দয়াগঞ্জের লোকেরা তাদের এই সংকটের কথা শুনতে পায়; তারা, ভূতের গলির লোকেরা বলে। (জহির : ২০০৪ : ৯)

পুরান ঢাকার বিস্তৃত পরিসরে সৃষ্ট এই সঙ্কটের ধরন সম্পর্কে পাঠক অবগত হয় পরের অনুচ্ছেদে – যা আবদুল করিমের ময়মনসিংহ গমনের ইচ্ছা ও কেচ্ছা-কেন্দ্রিক। আপাতভাবে খুব সাধারণ এই ব্যাপারটিকে বর্ণনা, সংলাপময়তা ও পুনরাবৃত্তভাবে পুরি খাওয়ার ঘটনায় গল্পকার হাজির করেন। আবদুল করিমের সমস্যা উন্মোচিত হয় তখন, যখন পাঠক জানতে পারে সে বেকার ও পিতৃব্যবসার হাল ধরতে অনিচ্ছুক। মহল্লার লোকেরা তার অদ্ভুত আচরণকে প্রথমত তার এই দ্বৈত-সংকট দিয়েই ব্যাখ্যা করতে চায়। কিন্তু যখন এমন ভাবনায় সুরাহা মেলে না, তখন এক মনস্তাত্ত্বিক খেলায় তারা মেতে ওঠে। আবদুল আজিজ ব্যাপারি কর্তৃক আবদুল করিমকে আলু দিয়ে বানানো ডালপুরি খাওয়ানোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি, ফুলবাড়িয়া থেকে চিনি, আলু কিংবা ডাল এনে দেবার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাপিয়ে মহল্লার অধিবাসীদের কাছে প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে আবদুল করিমের কথিত মেয়ে-বন্ধু শেফালি প্রসঙ্গ। কারণ সংস্কৃতিগতভাবে বেকার এক তরুণের মেয়ে-বন্ধুর বিষয়টি তাদের কাছে নানা গুঞ্জন ও বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে! তাদের ভাবনা আরো জটিল হয়ে ওঠে, যখন তারা জানতে পারে ডাল, আলু বা চিনি সে আনবে না। মহল্লাবাসী ও আবদুল করিমের ময়মনসিংহ যাওয়ার গল্পটি এ-দুয়ের মনস্তাত্ত্বিক খেলায় পরিণত হয় যেখানে কোনো এক পক্ষের জয়ী হবার ব্যাপারটিও তীব্রতা পায়। ফলত আবদুল আজিজ ব্যাপারির ছেলে দুলাল মিঞাকে নিয়ে করিমকে তার বন্ধুর বাড়িতে যাবার প্রস্তাব আসে। মহল্লাবাসীর ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সে যাত্রাও শুরু করে। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে শেফালি বা শেপালি বেগমের লিখিত ঠিকানা-অনুসরণে। মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে একদা আলাপ-পরিচয় ঘটা শেফালির হস্ত-লিখিত ঠিকানার প্যাস্টিচ[২৬] ঘটে গল্পে এভাবে–

> মোছাঃ শেফালি বেগম
> ফুলবাইড়া
> মৈমনসিং ...
> ঢাকা মহাখালি বাস স্ট্যান
> মৈমনসিং শহর, গাঙ্গিনার পাড়
> গাঙ্গিনার পাড়-আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে
> উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ গাছের (কড়ই গাছ) সামনে টিএনউ অপিস...
> আহাইলা/আখাইলা/ আখালিয়া নদী
> নদী পার হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে

> দুপুর বেলা যে দিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,
> ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে, হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেই দিকে
> নদীর পাড় বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ...
> অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়,
> যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,
> তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,
> পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি। (জহির : ২০০৪ : ২০-২১)

শেপালি বেগম প্রদত্ত এই ঠিকানা কাব্যধর্মী নিঃসন্দেহে। আবার কবির যেমন সৃষ্টির খেয়াল, আবদুল করিমেরও অল্প-পরিচিতা এই বন্ধুর বাড়িতে ভ্রমণের খেয়ালও তেমনি। দুলাল মিঞা ও আবদুল করিমের ফুলবাড়িয়া ভ্রমণের আদ্যন্ত গল্পকার তুলে ধরেন। ভ্রমণের একপর্যায়ে হঠাৎ আবদুল করিমের ইচ্ছের পরিবর্তন ঘটে এবং তারা মহল্লায় ফিরে আসে, যেমনটি আবেগ-নির্ভর কবিতার কবিগণ করে থাকেন। গল্পকারের বর্ণনা থেকে জানা যায় মহল্লাবাসী তাদের এমন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতই ছিল। গল্পের এই পর্যায়কে অ্যাবসার্ডও বলা যায়। কারণ অ্যাবসার্ডিজমে চূড়ান্তভাবে কাঙ্ক্ষিত বা প্রতীক্ষিত বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে না। আবার পুনরাবৃত্ত অর্থহীন আচার-অভ্যাসের দৃশ্য অ্যাবসার্ড সাহিত্যে দেখা যায়; এই গল্পে ‘হালারা আলু দিয়া ডাইলপুরি বানায়’ বলেও তা খাওয়ার পুনরাবৃত্তি এমনই দৃষ্টান্তবাহী। বন্ধুর বাড়ি নয়, ঠিকানামাফিক ভ্রমণই যেন এই গল্পের আবদুল করিমের গন্তব্য : যেমন সিদ্ধান্ত নয়, ডিসকোর্স সৃষ্টিই উত্তর-আধুনিকবাদের লক্ষ্য।

‘আমাদের বকুল’ প্রধানত নিম্নবর্গীয় গল্প। গ্রামীণ পটভূমিতে উপভাষিক সংলাপে গল্পস্থ নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক নানা বিষয়ের প্রতিফলনে এই পাঠ নিবিড় হয়ে ওঠে। সুহাসিনী গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর আকালু শেখ তেবাড়িয়া গ্রামের আইজ্জল প্রামাণিকের কন্যা ফাতেমাকে বিয়ে করে যৌতুক বা উপহার পায় একটি গরুর বকনা বাছুর। ফাতেমার অন্তর্ধানের বহুদিন পর সে যখন চান্দাইকোনা থেকে সখিনাকে বিয়ে করে, সে আবার একটি কালো রঙের গরু যৌতুক বা উপহার পায়। উৎসবহীন দুটি বিয়ের পর যখন গরুর পেছনে পেছনে ঘোমটা টান বধূ হেঁটে আসে তখন কৃষক ও ভূমিহীন দিনমজুরদের সংলাপে গ্রামীণ নিম্নবিত্তের বিবাহ সংস্কৃতির একদিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তার প্রথম স্ত্রী কৃষাণী ফাতেমার বিস্তৃত গেরস্থালির পরিচয়ে বিত্তহীন নারীর কর্ম-পরিধি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা মেলে। শ্বশুর-প্রদত্ত যে প্রাণিটি আকালুর অভাব-মোচনের সামগ্রী, ফাতেমার কাছে তা ততোধিক। তাই আকালুর গরু বিক্রির প্রস্তাবে সে ‘খুনখুন’ করে কাঁদে। আবার একই সময়ে ফাতেমা ও তার পিতৃপ্রদত্ত গরুর গর্ভবতী হওয়া এবং উভয়ের যমজ সন্তান প্রসবের পর –

> আকালু তার ছেলেমেয়ের নাম রাখে, আমির হোসেন এবং বকুল, অবসর সময়ে সে তার মেয়েকে ডাকে, আয়রে আমার বকুল ফুল; ফাতেমা কাজলা গরুর দুই বাছুরের নাম রাখে, ময়না এবং টিয়া; সে জাবনার চারিতে ভুসি গুলে দিয়ে ডাকে, আয় ময়না পক্ষি, টিয়া পক্ষি। (জহির : ২০০৪ : ৩২)

উদ্ধৃতিটি অবপ্রাণীর প্রতি ফাতেমার বাৎসল্যের প্রকাশক। সহকর্মী দিনমজুরদের সংলাপে অনুমিত হয় – আকালু স্ত্রীর আবেগ ও নিষেধ উপেক্ষা করে দুটি বাছুরসহ গরুটিকে বিক্রি করে দিয়েছিল। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে ফাতেমাও হারিয়ে যায়। সহ-উপমায় উপমিত আকালুর স্ত্রী ও গরু যেভাবে সমান্তরালভাবে দৃষ্ট হয় এই গল্পে, তাতে মানুষ ও অবপ্রাণীর মধ্যে এক-ধরনের সাযুজ্য স্থাপনের প্রয়াস গোচরীভূত হয়ে ওঠে। তাই ফাতেমার প্রিয় গরুটির মতো তাকেও আকালু বিক্রি করেছে কি-না, কৃষকদের সন্দেহ জাগে। তারা স্বামীকর্তৃক ফাতেমার খুনের সম্ভাবনার কথাও উত্থাপন করে। আকালুর নেতিবাচক জবাব শুনে তারা তাকে গ্রামের সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছোট মিঞাকে নিয়ে থানায় যাবার

প্রস্তাব দেয়। ছোট মিয়া আলতাফ হোসেন তাকে সহযোগিতা না করে ক্ষেপে গালিগালাজ করে গ্রাম থেকে উধাও হয়। আকালু একা বাসায় যায়। তারপরের ব্যাপারটি এ-রকম–

> থানার ডিউটি অফিসার এবং ছোট দারোগার আর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে না, আকালু ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এটা বুঝতে পারার পর সে নিশ্চিত হয় যে, এই হারিয়ে যাওয়া নারীর বিষয়ে কিছু আর করার নাই; তখন সে আকালুকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলে; সে বলে যে, কেস হলে তদন্ত করতে হবে, তদন্ত করতে গেলে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, কত লোককে হয়তো হাজতে নিয়ে রাখতে হবে, হয়তো আকালুকেও হাজত বাস করতে হবে; তখন এ এক মহা ঝামেলা হবে। সে আকালুকে বলে, কয়েকদিন অপেক্ষা কইরা দেখেন, হয়তো কোনখানে গেছে, আইসা পরবো! (জহির : ২০০৪ : ৩৫)

বিত্তহীন আকালু তার বিপদে আইন বা প্রশাসনের সহায়তা পায় না, এই গল্পে এই ঘটনার দৃষ্টান্ত প্রকটরূপে প্রতিভাত হয়। নিম্নবর্গীয় অধ্যয়নে নারীকে সমাজে 'অবস্থানহীন' [২৭] বলে ধরা হয়। ফাতেমার অন্তর্ধানে নিভৃতে তার সন্তানদ্বয় ছাড়া অন্য কারো কোনো দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া উত্থাপিত না হওয়ায় তত্ত্বীয় এই দিকটিই ফুটে ওঠে। আবার সমাজে বা তার ক্ষুদ্র একক পরিবারে যে ক্ষমতাকাঠামো থাকে বকুলের মাতৃহীন হবার পর এবং সংসারে সৎ মায়ের আবির্ভাবের পর এই অবস্থায় প্রান্তিকায়িত হবার ছোট্ট একটি সূত্রে তা পরিষ্কার হয়। মাতৃহীন শোকার্ত ছেলেমেয়েদেরকে মসজিদের ইমাম মোহসিন আলি এক বিকেলে দেখতে আসে এবং দেখে যে, 'আকালুর ঘরে বাঁশের মাচার ওপর বকুল ও আমির হোসেন ঘুমায়।

গল্পের শেষদিকের বর্ণনায় দেখা যায় – 'সে (বকুল) রান্নাঘরের মাচানের ওপর যখন শোয় শাড়িতে তার শরীর ঢাকা পড়ে না', (জহির : ২০০৪ : ৩৯) ছনের ঘরের মাচা থেকে রান্নাঘরের মাচানের এই অবস্থানগত দূরত্ব 'খারাপ' থেকে 'নিকৃষ্টতর'-এর পরিচয়বাহী। এই গল্পে লোককথা বা রূপকথার ফেবুলেশন ঘটেছে ইমাম কর্তৃক আকালু-ফাতেমার অবুঝ সন্তানদ্বয়ের প্রবোধকল্পে বিচিকলার গাছ লাগানো ও এর বাঁচা-মরার সম্পর্কসূত্রে ফাতেমার বাঁচা-মরার প্রসঙ্গে।[২৮] আবার প্রথম কলাগাছটার মৃত্যুর পর একই আদলের অসংখ্য কলাগাছের ঝোপ সৃষ্টি হওয়া, এই গাছগুলো আমির-বকুলের মাতৃ-অনুভূতি[২৯] এবং বকুলের দৈহিক সৌষ্ঠবে তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের সাদৃশ্য-আবিষ্কার একই সঙ্গে বংশগতিবিদ্যক ও বিভ্রমাত্মক বিষয়। বকুলের রজস্বলা হয়ে ওঠার ঘটনার ইঙ্গিত, মাতৃপ্রতিম গাছের কাছে আশ্রয় বা আকুতির দৃশ্য এবং পরদিন গ্রামের লোকদের 'বিচিকলার ঝোপের কাছে বকুলের রক্তাক্ত শাড়ি পড়ে থাকতে' দেখা এই গল্পের পূর্ব-নির্দেশিত যাবতীয় বিভ্রম, প্রশ্ন ও সংশয়কে ঘনীভূত করে তোলে। 'সুহাসিনীর লাল পিঁপড়া বকুলকে খেয়ে যায়' — বলে যখন গল্পকার গল্পের শেষ টানেন, তখন এবং পূর্বেও এই গল্পে পাঠকের অংশগ্রহণের বড় ও বহু পরিসর সৃষ্টি হয়ে থাকে। লাল পিঁপড়ে সত্যিই পিঁপড়ে হতে পারে, যেমনটি মার্কোসের উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল[৩০]; আবার এই পিঁপড়ে হতে পারে একটি প্রতীকমাত্র — ওঁৎ পেতে থাকা ধর্ষক; সদ্য-যৌবনপ্রাপ্ত বকুলের হত্যাকারী। এভাবে পাঠক- প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব এই গল্পের পাঠ-নির্মাণে আবশ্যকতা লাভ করে।

পুরান ঢাকার প্রাত্যহিক সংস্কৃতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা-অনুষঙ্গের ইতিহাসের অতীত-প্রক্ষেপণ রীতিগত মিশ্রণ এবং অবপ্রাণি হিসেবে বানরের ভূতপূর্ব ও বর্তমান কার্যের আপাত-গাল্পিক অথচ গুরুতর সংকেতবাহী ভূমিকার গল্প 'মহল্লায় বান্দর, আবদুল হালিমের মা এবং আমরা'। শিরোনামেই গল্পাখ্যানের ত্রি-ধারা স্পষ্টতা পাচ্ছে – একটি 'বান্দর'-কেন্দ্রিক, একটি আবদুল হালিমের মা-কেন্দ্রিক, অপরটি মহল্লাবাসী অর্থাৎ 'আমরা'-কেন্দ্রিক। এই গল্পটি পাঠ করতে হয় তৃতীয় উপ-আখ্যানের সাপেক্ষে; কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় উপ-আখ্যান অবয়ব পায় তৃতীয়টির ক্রিয়মাণতায়। আর এভাবে ভূতের গলির অতীত ও বর্তমানের ভাষিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপদর্শন ঘটে। যে বাক্যে গল্পের শুরু তা এরকম –

> ভূতের গলির লোকেরা বানর নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা দেয়ালের ওপর অথবা দূরে ছাতের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকা এই খয়েরি রঙের জানোয়ারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, বান্দর বান্দর, ওই যে বান্দর! (জহির : ২০০৪ : ৪০)

এর কালগত সীমা বর্তমানের। এর পরের অনুচ্ছেদেই ভূতের গলির লোকেরা 'প্রসন্ন হয়ে' অথবা 'জটিল সময়ের ভেতর কাহিল হয়ে বিরক্তির সঙ্গে' মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-অনুষঙ্গের কথা ব লে। পাঠক **১৯৭১** সালের ২ মার্চের পর দেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে থাকে; জানতে পারে, 'ভূতের গলিতেও অবধারিতভাবে একাত্তর সন নেমে আসে এবং তখন আবদুল হালিম এই সময়ের পাকচক্রে ধরা পড়ে।' এরপর ক্রমে মহল্লার লোকদের আবদুল হালিমের মায়ের কবরে বিলাপ, কিংবা নীরব বিলাপ ও কান্নার কথা শোনবার বর্ণনা আসে; পাঠক এও জানতে পারে, আবদুল হালিমের মা 'আর কাঁদে না', মহল্লাবাসীও ক্রমে আবদুল হালিমের কথা ভুলে যায়, কিংবা ভুলে না গিয়ে এই একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের নানা-প্রসঙ্গের স্মৃতি জাগরূক রাখে। তবে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে একটা জনগোষ্ঠীর চেতনা থেকে অপসৃত হতে হতে তা কেবল ঘটনায় পরিণত হয় এই গল্পে তারও ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় অন্তত দুটি সূত্রের উল্লেখে; এক – মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিমকে চেতনা-বিযুক্ত হিসেবে উপস্থাপনায়, দুই – মহল্লার বর্তমান বাস্তবতায় অর্থাৎ জটিল সময়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র/পিস্তলের উল্লেখে। নব্য-ইতিহাসবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গল্পকার যখন এই সময়ের ভাষ্য উপস্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেন তখন, মহল্লার লোকদের স্বাভাবিক জীবনবোধ ও সংলাপে ধরা পড়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গভীর চেতনাবাহী ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের অপসৃয়মাণ স্মৃতি-প্রসঙ্গ –

> ...তারা বলে, হালায় পাগল আছিল এউকগা; ভূতের গলির লোকেরা সকলকেই, হালা এবং পাগল বলে, এবং পরিবর্তিত সময়ের ভেতর অর্থহীন কলরব করে; তারা লেদ মেশিন চালায় অথবা দোলাইখালের রাস্তায় পুরানো মটর গাড়ির পার্টসের দোকানদারি করে, বিকাল বেলা হয়তো বুড়া বিহারির দোকানে বসে চা খায় এবং কথা বলে, এই হালায় মান্দার পোলা... (জহির : ২০০৪ :৪০-৪১)

গল্পের অন্যত্র–

> তখন বানরেরা একদিন এক কাণ্ড করে, তারা একটা আস্ত পিস্তল চুরি করে আনে; কেউ কেউ বানরদেরকে এই অস্ত্র নিয়ে খেলা করতে দেখে...তারা বুঝতে পারে না এই অস্ত্রটা কার, এবং তারা বলে, অইবো কারু, কত মাইনষের কত রকমের পিস্তল আছে মহল্লায়...তখন মহল্লার ছাতের ওপর দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বানরদের ঘুরে বেড়ানোর খবর হয়তো সূত্রাপুর থানার পুলিশদের কানে যায়, কারণ, সহসা একদিন তারা মহল্লায় এসে হাজির হয় এবং মহল্লার লোকদের পিস্তলের কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মহল্লার যারা পুলিশের সাথে কথা বলে তারা ঝামেলায় জড়াতে চায় না, প্রথমে চুপ করে থাকে, তারপর বলে, পিস্তলের খবর আমরা কি জানি, আমরা কুনো পিস্তলউস্তল দেখি নাইকা; (জহির : ২০০৪ : ৫৪-৫৫)

একটি স্বাধীন দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমনের সঙ্গে অবৈধ অস্ত্রের যোগাযোগ স্পষ্ট। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবলুপ্তির নিদর্শনের প্রমাণ এই ঘটনা।

শহীদুল জহির অতীত ও বর্তমানকে ওলটপালট করে দিয়ে যে কথন উপস্থাপন করেন, এই গল্পের আবদুল হালিমের কাহিনিতে তার মায়ের সংযোগস্থাপক-ভূমিকায় সময়ের সেই সেতু-সংযোগ নির্মিত হয়েছে। আর এতে সহায়ক থেকেছে মহল্লাবাসীর বয়ন, তা বলাবাহুল্য। আবদুল হালিমের মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা, আবু হায়দারের কন্যা হাসিনা আকতার ঝর্ণার প্রতি সৃষ্ট অনুরাগ ও ঝর্ণার যুদ্ধকালীন সময়ে মৃত্যু, হালিমের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও মৃত্যুর সংবাদ, ঝর্ণার চুলের ফিতা চুরি করে তার নিজের কাছে রাখা, তার মা কর্তৃক তা সংরক্ষণ এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মহল্লাবাসীর ভাবনায় এই কথনের গঠন। বানরের উপস্থিতি, উপদ্রব ও ভূতপূর্ব উপদ্রব্যের সাযুজ্য ও বয়ানে এই গল্পের

আরেক উপ-আখ্যান নির্মিত। গল্পের শুরু ও শেষ বানর-প্রসঙ্গেই। স্বামীর অকারণ গালমন্দে মন খারাপ করা মনোয়ারা কর্তৃক দৃষ্ট বানরের সঙ্গমদৃশ্য এবং 'মহল্লায় সূর্য ডুবে' যাওয়ার ব্যাপারদ্বয় ভূতের গলিতে অপসৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবসানান্তে অবপ্রাণিসদৃশ মহল্লাবাসীর একাংশের আচরণ এবং এর অপরাংশের মোহাবিষ্টতা এক দর্শক-জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। আর এভাবেই গল্পের প্রথমদিকে উল্লেখিত মহল্লাবাসীর 'জটিল সময়ের ভেতর কাহিল' মানুষের পরিবর্তিত ইতিহাস ও সংস্কৃতির জটিল পাঠ উদ্ধার হয়। এই গল্পে আরেকটি ঘটনায় দৃষ্টিপাত প্রয়োজন – সেটি হলো ক্ষমতাবান কর্তৃক অধস্তনদের দমন। বানর আব্দুর রহিমের ঘড়ি চুরি করার পর রহিম-পারভিন দম্পতি চুরির দায় আরোপ করে গৃহভৃত্য আকবর ও বাসনার মায়ের ওপর। তাদের নির্দোষ অবস্থান উপর্যুপরি স্পষ্টকরণের পরও তাদের কেবল অধস্তন হবার জন্যই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ক্ষমতাবান কর্তৃক এমন পীড়নে নিপীড়িতের প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম নেয় এবং তা থেকে জটিলতা আরো ঘনীভূত হয় – আকবরের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে। তার প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে বানরকে আক্রমণের খেসারত তাকেই দিতে হয়েছে বানর-কর্তৃক পুনরাক্রান্ত হয়ে। একদিকে ক্ষমতাকাঠামোর পীড়ন-ছকে নিপীড়িতকেই ভুক্তিভোগী হবার তত্ত্বীয় ছক গল্পে উঠে এসেছে, অপরদিকে মহল্লাবাসী কর্তৃক আকবরকে ক্ষ্যাপানোর জান্তব ইচ্ছা বা আনন্দে ও বানর-কেন্দ্রিক উল্লাসের গভীরে প্রকাশিত হয়েছে ব্ল্যাক-হিউমার। উল্লেখ্য, নব্য-ইতিহাসবাদ, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, ক্ষমতাতত্ত্ব বিষয়গত দিক থেকে উত্তর-আধুনিকবাদের প্রধান প্রধান আলোচ্য; আর সময়ক্রম ভেঙে দেয়া বর্ণনারীতি, ব্ল্যাকহিউমার সৃষ্টি প্রভৃতি উক্ত মতবাদের প্রাকরণিক প্রকাশ।

উত্তর-আধুনিকবাদী নিরীক্ষাজাত শহীদুল জহিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'ইন্দুর-বিলাই খেলা'। 'তিনটি ছক', 'সংজ্ঞা', 'খেলার প্রকার', 'খেলার পদ্ধতি', 'খেলার সাতটি নমুনা' এবং 'খেলার শেষ' – এসব শিরোনাম ও বিষয়গুলোতে যে ইন্দুর-বিলাই খেলার আদ্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে, তা ক্ষমতার তত্ত্ব সম্পর্কিত। উত্তর-কাঠামোবাদের (পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম) আওতায় কোনো বিষয়ের প্যারাডাইম শিফটের[৩১] যে ব্যাপার আলোচিত হয়ে থাকে, এই গল্পে ইন্দুর-বিলাই খেলা অর্থাৎ ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের সর্বব্যাপ্ত খেলায় সেই আন্তর্কাঠামোগত পরিবর্তনই দৃষ্ট। ইন্দুর-বিলাই খেলা যে ক্ষমতাবানের ক্ষমতাপ্রদর্শন ও ক্ষমতাহীনের নিরন্তর 'লৌড়ানোর' বাস্তব খেলা, তা গল্পের সমাপ্তিতে 'খেলার শেষ' অংশে গল্পকার সরাসরি জানিয়ে দেন –

> এই খেলার শেষ নাই, খেলোয়াড়ের শেষ আছে; খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে যায়, কিন্তু খেইল জারি থাকে। উল্লেখ্য যে, বালকদের খেলা ছাড়া অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণে, যেমন : বুইড়া হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা খেলতে খেলতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে গেলে কিংবা জীবনে হঠাৎ দরবেশি ভাব দেখা দিলে, কেবল বিলাইরা ইচ্ছা করে খেলা ছেড়ে যেতে পারে, ইন্দুররা পারে না; বিলাই খেলতে চাইলে ইন্দুরকে খেলতে হবে। (জহির : ২০০৪ : ৮০)

'ভূতের গলিতে ইন্দুর-বিলাই খেলা হয়' – বাক্যে গল্পের শুরু, কিন্তু গল্পের পাঠান্তে পাঠকের মনে হয় এই খেলার ভূগোল ভূতের গলিতেই সীমাবদ্ধ নয় – এর ব্যাপ্তি অনেকদূর প্রসারিত : তাত্ত্বিক পরিভাষা ধার করে তাকে বলা চলে রাইজোমেটিক, অর্থাৎ এই খেলার একটা অংশমাত্র ভূতের গলি-কেন্দ্রিক; এর বিশাল কাণ্ড গোটা সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্বময় বিস্তৃত। ইন্দুর-বিলাই খেলার সংজ্ঞা, প্রকার, খেলার পদ্ধতি ও খেলোয়াড়গণের স্থান-কাল গল্পের পাঠান্তে বিশেষ থেকেও নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে সাতটি ইন্দুর-বিলাই খেলার ধরন বা নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে – ১. বালকদের খেলা; এখানে বিলাই বাবুল মিঞা, যে বালকদের সর্দার ও ৩৩ নম্বর বাড়ির পুরনো ভাড়াটে। ইন্দুর, ৩২ নম্বর বাঘওয়ালা বাড়ির নতুন ভাড়াটে বালকসহ অনেকে। বাবুল মিঞা ও তার দল কর্তৃক প্রতিনিয়ত র‍্যাগিংয়ের শিকার হওয়া বালকদের ইন্দুর-দল 'ইন্দুর' হতে পেরে উল্লসিত। তাদের এই উল্লাস তাদের অভিভাবক ও বাড়িওয়ালির অপছন্দ, কারণ বড়োরা এই খেলার নির্মমতা তাদের

অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছে। তাই বীরাঙ্গনা খতিজা বেগম বলে, 'দুনিয়ায় কত ইন্দুর!' মূলত এই গল্পে খতিজাও ইন্দুররূপে প্রতিভাত হয় মুক্তিযুদ্ধকালে। মহল্লায় 'ইন্দুর-বিলাই খেলার জন্ম' ১৯৭১ সালেই, যখন রাজাকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনি এখানে মহল্লাবাসীকে ইন্দুরে পরিণত করে। মিলিটারির আগমনে মহল্লাবাসীর প্রাণভয়ে পলায়ন ছিল বিলাইয়ের তাড়ায় ইন্দুরের গর্তে পলায়নের মতোই। এই খেলার ধরন রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন গৃহফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে রাজাকারদের পলায়ন ও উৎখাত ঘটে। অর্থাৎ এ-পর্যায়ে বিলাই হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাগণ, আর রাজাকাররা ইন্দুর। 'নমুনা ৩ : খতিজার কথা' উপশিরোনামে বীরাঙ্গনা খতিজার মুক্তিযুদ্ধকালীন মর্মন্তুদ পরিণতি ও রাজাকার কমান্ডার আবদুল গণিকে ভাত রান্না করে খাওয়ানোর অনিচ্ছাকৃত বাধ্যবাধকতার আখ্যান। পাকিস্তানি মিলিটারিদের কাছে সম্ভ্রম হারানো খতিজাকে পুনরায় সম্ভ্রম হারাতে হয় রাজাকার কমান্ডারের কাছে। প্রাণভয়ে এই 'খেলা' তাকে জারি রাখতে হয়। কারণ ইন্দুরের ইচ্ছায় এই খেলার অবসান ঘটে না। নমুনা ৪-এ দৃষ্ট হয় মহল্লার সন্ত্রাসী হুমু জোহুর কাণ্ড। বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকের পটভূমিতে উদ্ভূত সন্ত্রাসীরা কীভাবে জনজীবন বিপন্ন করেছিল, সাধারণ মানুষকে 'ইন্দুরে' পরিণত করেছিল এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইন্দুর-বিলাই খেলায় সায় না দেয়ায় কীভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তারই খতিয়ান এটি। খেলার ৫ম নমুনাটি বীরাঙ্গনা খতিজার স্বাধীন দেশে লাঞ্ছিত হবার ঘটনাকেন্দ্রিক। মুক্তিযুদ্ধের দিশেহারা পরিস্থিতিতে সম্ভ্রম হারানো এই নারী গৃহফেরত মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলমের অজ্ঞতাপ্রসূত প্রতিশোধস্পৃহার শিকার হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকৃত পরিস্থিতি জ্ঞাত হয়ে তার সঙ্গে শামসুল আলমের বিয়ের প্রস্তাব এলে সে প্রত্যাখ্যান করে। মহল্লার লোকদের ভাষ্যানুযায়ী, 'এরপর শামসুল আলমের বাঁচার আর উপায় থাকে না।' – শামসুল আলমের এই পরিণতি পুনর্নির্যাতিত এক ব্যক্তিত্বময়ী বীরাঙ্গনার তেজের কাছে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়জ্ঞাপক মৃত্যু। এই খেলায় খতিজা প্রথমে ইন্দুর ও শামসুল আলম বিলাই হলেও, পরবর্তীকালে খেলার ছক পাল্টে যায়। ৬ নম্বর নমুনা : 'ধুতুম পক্ষী'; সংখ্যাগুরু এক সমাজে রাজনৈতিক ইস্যুতে সংখ্যালঘুর যাপন-সমস্যা-কেন্দ্রিক। এতে নির্বাচন-প্রার্থী ও তার দলবল বিলাই, পূর্ণলক্ষ্মীর পরিবার ইন্দুর। খেলার সপ্তম ও শেষ নমুনার নিয়ন্ত্রক মানুষ নয় – মশা। ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী এডিস মশা কীভাবে মহল্লার প্রভাবশালী ও প্রভাবহীন নির্বিশেষে সবার জন্য আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে ও শামসুল আলমের অমোঘ পরিণতি নির্ধারণ করে দেয় তার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, তারই কাহিনি এই গল্পাংশ। এভাবে বালক, রাজনীতি, সন্ত্রাস, রোগ কিংবা অন্য অনেক বিষয়ে ক্রমে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন হয়ে 'ইন্দুর-বিলাই খেলা'র বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে। আর এই খেলা চলে আমৃত্যু, সর্বত্র। খেলা, বিশেষত ভাষিক খেলা (ল্যাংগুয়েজ গেইম) উত্তর-আধুনিকতাবাদের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলাই যখন ইন্দুরকে বলে 'লৌড়া' তখন এর ভেতর যে কর্তৃত্ব, আবশ্যকতা বা বিকল্পহীনতা লুক্কায়িত থাকে, তা বিলাইয়ের অধিকৃত ও চর্চিত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশক হয়ে ওঠে। আবার বালকদের বাবুল মিঞা-প্রবর্তিত খেলায় 'বিলাই' হতে পেরে 'উল্লসিত' হবার পেছনে থাকে তাদের ক্ষমতাচক্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতাকেন্দ্রের 'অন্য' (other)-এর স্বীকৃতিগত মনস্তত্ত্ব। আর মেয়েদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণের ফলে অভিভাবক কর্তৃক বালকদের নিন্দাবচন ও মেয়ে হওয়ায় জহুরাকে 'বিলাই' বা 'ইন্দুর' কোনো পক্ষেই গ্রহণ না করার ভেতর তার (জহুরার) প্রান্তিক (marginal) অবস্থান স্পষ্টতা পায়। আবার সংখ্যালঘুর প্রতি বিরূপ নেতার নির্বাচনে জয় লাভের পর ভয়ে পূর্ণলক্ষ্মীকে বাড়ি থেকে বের হতে না দেয়ার ব্যাপারটিতে মহল্লার প্রান্তিক এক পরিবারের সঙ্কট প্রকাশ পায়। এভাবে সাহিত্যিক ভাষা-কাঠামোর ভেতর ক্ষমতার রাজনীতি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে গল্পটিকে করে তুলেছে উত্তর-আধুনিক অনুষঙ্গ-প্রধান। তাছাড়া গ্রাফিতি, ছড়া ও নির্বাচনী শ্লোগানের প্যাস্টিচধর্মী প্রয়োগও এই গল্পে ঘটেছে।

'প্রথম বয়ান' গল্পটির বিশ্লেষণে বর্ণনা বিদ্যার (ন্যারেটোলজি)[৩২] আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'কোথায় পাব তারে'-তেও এই সূত্র প্রযোজ্য। কারণ, দুটি গল্পই বর্ণনাত্মক, এবং

সাদৃশ্যপূর্ণ আন্তর্বৈশিষ্ট্যক কাঠামো ও উপাদানে নির্মিত। বর্ণনবিদগণ (ন্যারেটোলজিস্ট) স্পষ্টভাবে 'স্টোরি' ও 'প্লটের পার্থক্যকে নির্দেশ করেন।[৩৩] আলোচ্য গল্পে ভূতের গলির প্রৌঢ় বাসিন্দা আব্দুর রহমানের শোক, চল্লিশ বছর আগে রাস্তার কিনারায় জ্বলা কেরোসিনের বাত্তির স্থান-অন্বেষণ এবং এ-কাজে ক্লান্ত হয়ে এলে ইলেক্ট্রিকের খাম্বায় ঠেস দিলে হাতের আঙ্গুলে নরম কাদার মতো চুন বা কাকের বিষ্ঠা লাগলে পান-বিড়ির ভাড়াটে দোকানদার ইদ্রিস আলির সঙ্গে কথোপকথন ও পানের বোঁটা খাওয়ার পুনরাবৃত্ত প্রায়-প্রাত্যহিক আচরণের বর্ণনাসূত্রে ক্ষীণ-অবয়ব এক প্লটের সৃষ্টি হয়েছে। 'কোথায় পাব তারে' গল্পে যেমন আবদুল করিমের মৈমনসিং ভ্রমণ-প্রসঙ্গ ও আজিজ ব্যাপারীর আহ্বানে পুরি খাওয়ার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। আবার আলোচ্য গল্পের 'স্টোরি' আব্দুর রহমান ও সুপিয়া আকতারের অনুরাগ, ১৯৭১ সনে সাক্ষাৎ ও পূর্বস্মৃতির শোকগ্রস্ততায় আব্দুর রহমানের বর্তমানকেন্দ্রিক। প্লটের সঙ্গে স্টোরির পার্থক্যের স্পষ্টতা নিয়ে এ-দুয়ের সংযোগ ঘটে গল্পের এক-তৃতীয়াংশের প্রথমাংশের শেষদিকে–

> 'কেরোসিনের বাত্তির গল্পের সঙ্গে সুপিয়া আকতার এবং চম্পা ফুল গাছের ভাঙ্গা একটা ডালের কথা প্যাঁচ খায়া জড়ায়া যায়; তবে আব্দুর রহমান মনে হয় দীর্ঘদিন এই গল্প সম্পর্কে বেখেয়াল হয়া থাকে।' (জহির : ২০০৪ : ৮৫)

বর্ণনবিদ্যার আদি ধারণা এরিস্টটলের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ)। তিনি চিন্তা, চরিত্র (Character) ও ক্রিয়া (active)-কে গল্পের অপরিহার্য অংশ বলেছেন তাঁর 'পোয়েটিক্স'-এ। তিনি বলেন, চরিত্র অবশ্যই ক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মোচিত হবে। আর তা হবে প্লটের মাধ্যমে। তিনি প্লটের তিনটি উপাদানের কথা বলেন –

১.The hamartia : যার অর্থ 'পাপ' (sin)) বা ভুল (fault), ট্র্যাজেডিতে কোনো চরিত্রের অধঃপতন হয়; এ কারণেই তাকে 'tragic flaw' বলা হয়েছে (ব্যারী : ২০১৮ : ২০৯)। আলোচ্য গল্পে আব্দুর রহমান চল্লিশ বছর আগে সুপিয়া আকতারের অনুরাগ-প্রকাশক ইঙ্গিত অর্থাৎ চম্পা ফুলের ডাল ভেঙে ফেলে যাওয়ার ব্যাপারটি না বুঝতে পারার মাধ্যমে ভুল করে।

২. The anagronisis : যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'recognition' বা 'realisation', অর্থাৎ কোনো রচনায় নায়ক যখন বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারে; নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে আত্মবোধ লাভ করে। আলোচ্য গল্পে –

> ...অনেক দিন পরে একাত্তর সনে জিঞ্জিরায় পালায়া যাওয়ার পর চরাইল গ্রামে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়া থাকার সময় সুপিয়া আকতারের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়; তবে সুপিয়াকে দেখে হয়তো তার কিছু মনে হয় না, কারণ তার এমনই স্বভাব, বেহুঁশ হয়া থাকে! কিন্তু তারপর সুপিয়ার সঙ্গে যখন তার কথা হয় তখন এতদিন পর তার হয়তো সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে, এবং মহল্লার লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, জিঞ্জিরায় সুপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিন আব্দুর রহমানের এই দুঃখ অথবা শোকের জন্ম হয়।। (জহির : ২০০৪ : ৮৫)

৩.The Peripeteia : যার ইংরেজি প্রতিশব্দ দাঁড়ায় 'turrn-own' or 'reversal' অর্থাৎ ভাবের পরিবর্তন। ধ্রুপদী ট্র্যাজেডি নাটকে এর অর্থ দাঁড়ায় উচ্চ অবস্থান থেকে নায়কের অধঃপতন। এই গল্পে সুপিয়ার অতীত কর্মকাণ্ড ও এর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের বোধ্যতার অপারগতাজাত আব্দুর রহমানের শোক, স্মৃতি কিংবা অতীত সময়ের স্মরণ চেষ্টায় কেরোসিনের বাত্তি-জ্বলা স্থানের সন্ধান ও ব্যর্থতায় মাথাধরা ও দোকানদারের সঙ্গে কথোপকথনে তার বেহুঁশ হয়ে থাকা স্বভাবের কার্যকারণ স্পষ্টতা পায়।

আলোচ্য প্লটটি হলো স্টোরির ফ্রেম[৩৪] – গল্পের ভেতরে যে গল্পটি রয়েছে, তা পরিবেশনের জন্যই এই ফ্রেম জরুরি। গল্পের শেষে এই ফ্রেম ও স্টোরির পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বৈত-সমাপ্তিতে (double ended)।

কারণ, গল্পের শেষে ইদ্রিস আলির দোকানে কথোপকথনরত আব্দুর রহমানের উপস্থিতি যেমন রয়েছে, তেমনি গল্প-অংশের সুপিয়া আকতারের প্রসঙ্গে নতুন এক বিভ্রান্তিতে এসে কাহিনি এগিয়ে গেছে। আর এখানেই বর্ণনবিদদের স্টোরিকে 'ডিসকোর্স' বলার[৩৫] পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। বস্তুত এখান থেকে ভিন্ন নতুন এক গল্পের বা সিদ্ধান্তের আলোচনার সূত্রপাতও ঘটে।

গ্রন্থের নামগল্প 'ডলু নদীর হাওয়া'-কেও অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্পের বিশ্লেষণসূত্র অর্থাৎ বর্ণনবিদ্যার সাহায্যে পাঠ করা যায়। তবে অন্তত আরো চারটি সক্রিয় সূত্র এই গল্পের বিশ্লেষণে কার্যকরতা পায় – ফেবুলেশন, ক্ষমতাতত্ত্ব, জেন্ডার স্টাডিজ[৩৬] ও ইকোফেমিনিজম[৩৭]। প্রাসঙ্গিক স্থানে আলোচনায় এসব সূত্রের প্রয়োগ ও প্রক্রিয়া লক্ষণীয় হবে।

ডলু-নদী তীরবর্তী লোকালয়ের বাসিন্দা বয়স্ক তৈমুর আলি চৌধুরীর অবসন্নতার বর্ণনায় এই গল্পের শুরু। তারপর তার যুবককালের কথন, সমর্ত বানুকেন্দ্রিক আখ্যান, তার খোঁড়া হবার কাহিনি, অদ্ভুত সংসার-যাপন, রহস্যজনক মৃত্যু এবং তার স্ত্রী সমর্ত বানুর আলিকদম গমন – মোটাদাগে এটিই এই গল্পের স্টোরিলাইন। এই কাহিনির কালিক-বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, বর্তমানে বৃদ্ধ তৈমুর আলি চৌধুরীর কথন অতীতের দিকে যাত্রা করে আবার যখন বর্তমানে ফিরে আসে তার মৃত্যু-ঘটনার বর্ণনায়, তখন এই বর্তমান বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করে না অতীতের সঙ্গে । কিন্তু এই কথন তৈমুর আলির যতটা, তার চেয়ে বেশি সমর্ত বানুর। তাই আখ্যানের তৈমুর-বৃত্ত থেকে বের হয়ে সমর্ত ওরফে এলাচিংয়ের আলিকদম যাত্রার কথা জানা যায়। শেষ দুই অনুচ্ছেদে এলাচিংয়ের হীরের আংটি-কেন্দ্রিক ঘটনা ও বর্ণনা গল্পের পরিশিষ্টের মতোই। কথিত জাদুবিদ্যাসিদ্ধ এলাচিংয়ের আংটির স্বচ্ছ পদার্থটি হীরে নয়, কাঁচ – এই সত্য প্রতিষ্ঠায় গল্পের অলৌকিকতা খণ্ডনের সূত্রমুখ উন্মোচিত হলেও সবকিছু জানার পর এলাচিংয়ের ছোট পুত্র মিরাজ মিঞা চৌধুরীর 'আংটিটার উপর মায়া দেখা দেয়।' এতে এই গল্পের আখ্যান-পরিভ্রমণের নিষ্পত্তি ঘটে (অথবা ঘটে না) বিভ্রম থেকে মায়ার পথে। উল্লেখ্য, বিভ্রম বা ইল্যুশন সৃষ্টি শহীদুল জহিরের একটি পুনরাবৃত্ত কথন-প্রক্রিয়া। এই গল্পে বেশ কয়েকটি বিভ্রমসৃষ্টিকারী দৃশ্য, ব্যাখ্যা ও বর্ণনার দেখা মেলে। আলোচ্য গল্পাংশের সূত্রে যৌনতাকেন্দ্রিক লোকাচারের অনুসৃতির বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে, যেখানে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জনভাবনার উল্টোদিকে নীরব ও ভয়াবহভাবে এক নারীর ক্ষমতা ও কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে; আর এভাবে ট্যাবো ভাঙার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ফুকোর বক্তব্য (ক্ষমতার অর্থ শুধু নিষেধাজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ইচ্ছাও আসলে এক ধরনের ক্ষমতা।)[৩৮] আবার বিত্তশালী, ক্ষমতাবান তৈমুর আলি তার বিত্ত-প্রভাব ও পুরুষত্বের প্রামাণ্যতায় মগের মেয়ে অঙমেচিং ও জসিমউদ্দিন ওরফে জইস্যা করাতির মা-মরা 'তাগড়া', 'সুন্দরী' ও 'পাকনা' মেয়ে সমর্ত বানু ওরফে এলাচিং-কে কাজের মেয়ে হিসেবে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে ব্যর্থ হয় এবং পরে বিয়ে করে। বিয়ে করতে গিয়ে দরিদ্র, অসহায়, ক্ষমতাহীন কিন্তু কৌশলী ও প্রতিশোধপরায়ণ সমর্তর সঙ্গে তৈমুরের গৃহ-প্রবেশের শর্ত পালন করতে গিয়ে পঙ্গু হতে হয়। সমর্তের প্রেমিক সুরত জামালকে কৌশলে কাজ দিয়ে আলিকদম পাঠিয়ে দেয় তৈমুর। সমর্ত বানুকে পেতে যে অসম ক্ষমতা ও কৌশলের দ্বন্দ্ব এই গল্পে সৃষ্টি হয়েছে তাকে পাঠ করা যায় ইকোফেমিনিজমের আলোকে। সমর্তের প্রকৃতিবৎ নির্দ্বন্দ্ব জীবনে তৈমুরের দখলদারি মনোভাবের প্রয়োগ না ঘটলে এই বিপর্যয় সৃষ্টি হতো না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির দরিদ্র সমর্ত লড়তে পারবে না জেনে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তার প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে রাখে ও বাস্তবায়ন করে এবং গল্পের শেষে যখন একটি জটিল দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে তৈমুর আলির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, তখন সে তার ছেলেকে বলে তাকে আলিকদম রেখে আসতে। স্মর্তব্য, এই আলিকদমেই তার সাবেক প্রেমিককে তার মৃত স্বামী একদা কাজের ছলে প্রেরণ করেছিল। এই স্থান এখন এই নারীর কাছে প্রণয়ীর আবাসস্থল নয়, তা তার যৌবনের ক্ষমতাহীন অসহায়ত্বের লাঘব-চিহ্ন – তার ইচ্ছার পরম পূর্ণতা। ইকোফেমিনিজমের প্রথম-দিককার ধারণাপর্বে ফ্রাঁসোয়া দা ওবোঁন (Francoisc d Eaubonne) তাঁর

লে ফেমিনিজম উলামো (Le Feminisme O lamort)-তে ১৯৭৪ সালে যে-রকম যুক্তি ও পাল্টাযুক্তির সমন্বয়ে এই তত্ত্বের সূচনা করেন, এই গল্পে সে সবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। একটি পক্ষ দুর্বল বলে অন্যপক্ষ তাকে শাসন ও পরিচালনা করবে নারী-নিসর্গবাদ তা স্বীকার করতে নারাজ। এই গল্পের সমর্ত-তৈমুর জুটির মধ্যে সমর্ত দুর্বলপক্ষ বলে সবলপক্ষ অর্থাৎ তৈমুর কর্তৃক পরিচালিত হয়নি। বরং বিভিন্ন শর্ত – 'জহর দিয়ে মারার' ইচ্ছা ও উদ্যোগ জারি রেখে সমর্ত অনেকাংশে খেলাচ্ছলে তৈমুরের জীবনকে পরিচালিত করেছে। সমর্তের এই নিয়ন্ত্রণনীতি বা পরিচালন-ক্ষমতাকে জেন্ডার স্টাডিজের আওতাতেও দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য 'নারী' বা 'পুরুষের' জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ধারণ করে লৈঙ্গিক রাজনীতি, যেখানে সুবিধাবাদী ও আধিপত্যবাদী অবস্থান গ্রহণ করে পুরুষগণ। যুবাবয়সে তৈমুর আলির ভয়ে ভীত ও তৈমুর কর্তৃক নির্যাতিত যুবতী মেয়ে ও তাদের মায়েদের দুঃখ-দুর্দশার বিপরীতে তৈমুরের বাবা মওলা বকশের নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতা জড়িত; তবে লৈঙ্গিক রাজনীতি সম্পর্কিত লেখকের বক্তব্য – '...সে (মওলা বকশ) ছেলের বাপ হওয়ায় সুবিধাজনক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে বলে, আঁই ন জানি, আঁই কি কইরতাম!' (জহির : ২০০৪ : ১০১) আরেকটি দৃষ্টান্তে এই তত্ত্বীয় ব্যাপারটি আরো স্পষ্টতা পাবে; সেটি হলো সমর্ত-তৈমুরের বিয়ের রাতের একটি ঘটনা। প্রাসঙ্গিক ঘটনাংশের বর্ণনা –

> যারা বিড়াল মারার পুরানো গল্প জানে তারা হয়তো খুশি হয় এই কথা ভেবে যে, তৈমুর আলি বিয়ের রাতে তাহলে বিড়াল মারলো! তবে সমর্ত বানু বিড়াল মারলেও তখন তৈমুর আলির চেহারা দেখলে মনে হতো যে, সেটা সেই মেরেছে, রাগে তার চোখমুখ থেকে ভাপ বের হতে থাকে এবং সেদিন উত্তেজনা ও ক্রোধের এই সম্মিলিত দানবীয় প্রকাশের সামনে সমর্ত বাত্যাপীড়িত তৃণের মত দলিত হয়;'(জহির : ২০০৪ : ৯৯-১০০)

'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে গল্পকার মূলত একটি বিশেষ অঞ্চলের নির্বিশেষ শিল্পায়নের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে অবিনির্মাণের আওতায় বিমূর্ত শিল্পের রচনাকারদের জীবনেতিহাস ও তার কারুণ্যকে উপজীব্যতা প্রদান করেছেন তিনি। এই দ্বৈত বিষয়কে জহির উপস্থাপন করেছেন ভাষিক সেলাইয়ের চাতুর্যে। 'সেলাই' বলা হচ্ছে এজন্য যে, এর অন্তঃস্থ ক্ষীণ কাহিনি ও ঘটনাবলিতে বিখণ্ডভাবে যে উপায়ে গল্পকার কমা-সেমিকোলনের সাহায্যে দীর্ঘ বাক্যে উল্টে-পাল্টে কিংবা এফোঁড়-ওফোঁড় করে সংযুক্ত করেছেন, তা কেবল সেলাই-উপমাতেই ধারণ করা যায়। দক্ষিণ মৈশুন্দিতে কেবল তরমুজ কৌটাজাতকরণের জন্য 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা ও এর পটভূমি এবং তরমুজ অপছন্দকারী পরিবারের দুই সহোদর আজিজুল হক ও আমিনুল হকের পরিণতি সেই সেলাই-গাঁথুনিতে যুক্ত দুই ভিন্ন বিষয়। কৃষিজ খাদ্যসংস্কৃতি থেকে ক্রমে মহল্লার বাসিন্দাদের কারখানাজাত খাদ্যসংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশের দিকটি এই গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে তরমুজ-কথনে, লেবেঞ্চুশ কারখানার নির্মাণে, কফিলুদ্দিন ব্যাপারির নতুন বিস্কুট-কারখানার উদ্বোধনে এবং চূড়ান্তভাবে মৃত্যুশয্যায় হাজি আব্দুর রশিদের তরমুজ খেতে না পারার সংকটে তার বড় ছেলে হাজি রইসউদ্দিন কর্তৃক 'কৃষক এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভর' না করার বিকল্প উপায় হিসেবে তরমুজের ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠায়। এর ভেতর গল্প-পাঠে কয়েকটি ক্রমিক সূত্র কিংবা দৃষ্টান্ত আবিষ্কৃত হয় মহল্লার জনজীবনে শিল্পায়নের প্রভাব ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের চিহ্নস্বরূপ – ১. স্কুলগামী বালকদের হৈচৈ-এ স্বল্প-সংখ্যক কারখানার শব্দ ঢেকে যাওয়ায় মহল্লায় শিল্পায়নের প্রাথমিক ধাপের বাস্তবতা বোঝা যায়; ২. উপপ্রধানমন্ত্রীর ভাষণে 'দোলাইখালে দক্ষিণ মৈশুন্দি ইত্যাদি এলাকার লোক ছোটো লেদ কারখানায় নীরবে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তার মূল্যায়ন' ও প্রশংসা। ফলে লেদ-কারখানার স্থাপন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমর্থন ও স্বীকৃতি অর্জিত হয়। এ মহল্লায় লোকসমাগম বৃদ্ধি, পাটুয়াটুলির কাপড়ের ব্যাপারি ইয়াকুব আলি কর্তৃক মহল্লায় চার নম্বর লেদ মেশিন স্থাপন এবং মেশিনের শব্দ ও কিশোরদের খেলাধুলার শব্দে মহল্লার জনজীবনের বিঘ্ন সৃষ্টি, এর ফলে তাদের মাথা ধরা ও মাথাব্যথার জন্য কডোপাইরিন সেবন।

৪. ট্রাকের টায়ার টিউব ও খুচরা যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাক ধর্মঘটের ফলে রাজশাহী, বগুড়া ও চট্টগ্রাম থেকে তরমুজ না আসা। অল্প সরবরাহে তরমুজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মহল্লার লোকেরা এই বিষয়ে উৎসুক হয়; তারপর –

> ...মহল্লায় যারা যন্ত্রাংশের দোকানদারি করে আমরা তাদের কাছে যাই এবং যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধির দুটো কারণ জানতে পারি...লেদ মেশিনের কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে, কর বসানো হয়েছে, তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, যেমন চাল, ডাল, তরমুজের দাম বেড়েছে, কাজেই তারা কী করে পারে; তার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারি কেমন করে তরমুজের দাম বাড়ে বলেই তরমুজের দাম বাড়ে, তরমুজ কেমন করে নিজের দাম নিজে বাড়িয়ে নেয় একটি চক্রের ভেতর দিয়ে, এবং এই চক্রের ভেতর আমরা দক্ষিণ মৈশুন্দির অবস্থান আবিষ্কার করি, আমরা তরমুজের দাম কমানোর কোনো পথ খুঁজে পাই না, ত্রিশ টাকা থেকে নেমে তা পঁচিশ টাকায় স্থায়ী হয়, ফলে আমাদের তৈরি বিস্কুট, লজেন্স, নাটবল্টুর দাম বাড়ে; তরমুজের মতো চমৎকার একটি জিনিস আমাদের জীবনকে কেমন জটিল করে তোলে, (জহির : ২০০৪ : ১২৭)

শিল্পায়নের ফলে মহল্লার বাসিন্দাদের চোখ ও জীবনে কেবল উক্ত পরিবর্তন নয়, তাদের সমাজ, আচার, সম্পর্ক ও জীবিকার প্রতিটি স্তরে তা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় উপনীত হয়। এই গল্পের অপর আখ্যান-ধারা বিশ্লেষণে তা স্পষ্টতা পায়। নিঃসন্তান বিধবা বৃদ্ধা রহিমা বিবি হিবাদলিল করে দোহার অথবা নবাবগঞ্জ-আগত তিন সন্তানসমেত আগত আবদুল গফুরকে তার বাড়িসহ জায়গা দান করলে মহল্লার বাসিন্দাদের ভাবনানুযায়ী 'মটর পার্টসের অথবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানদার' না হয়ে নারিন্দা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি শুরুর মাধ্যমে 'মহল্লার শিল্পায়নের ইতিহাস বদলে' যাবার সম্ভাবনা রহিত করে দেয়। এই পরিবার মহল্লার বাসিন্দাদের ব্যাপারে নিরাসক্ত ভাব পোষণ করে, এখানকার বাসিন্দাদের 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য'রূপে বিবেচিত তরমুজকে অপছন্দ করে এবং গফুরের দুই ছেলে ও এক মেয়ে (আজিজুল হক, আমিনুল হক, শেফালি আক্তার) যথাক্রমে মহল্লার একমাত্র কবি, একমাত্র প্রেমিক ও একমাত্র 'ঘর-পলাতক নারী'-রূপে আবির্ভূত হয় আখ্যানে। আর মহল্লার লোকদের স্মৃতিতে একমাত্র যে আত্মহত্যার ঘটনার কথা গেঁথে আছে, 'ঘর-পলাতক নারী'-রূপে আবির্ভূত হয় আখ্যানে। আর মহল্লার লোকেদের স্মৃতিতে 'একমাত্র যে আত্মহত্যার ঘটনার কথা গেঁথে আছে, সেটি আবদুল গফুরের। গফুরের তিন সন্তানই গল্পে কোনো না কোনো বিভ্রমে পতিত বা বিভ্রম সৃষ্টিকারী। তরমুজের আসল-নকল বিতর্কের সঙ্গে মহল্লার বাসিন্দাদের মনে জ্ঞানের বিভ্রম (ইল্যুশন অব নলেজ) সৃষ্টি হয়, এবং তা গাঢ় হয় শেফালিকে কেন্দ্র করে। তারা মনে করে শেফালি গাছ অথবা ফুল অথবা ফুলগাছ, মহল্লায় শিল্পায়নের ইতিহাস সৃষ্টির সমান্তরালে এই শেফালিকে তারা হারিয়ে ফেলে। আবদুল গফুর যখন মহল্লাবাসীকে 'তরমুজখোর' বলে গালি দেয়, মহল্লার লোকেরা তাকে 'পাগলের গুষ্ঠি' বলে পাল্টা গালি দেয়। পাগলামি বা উন্মদগ্রস্ততা উত্তর-আধুনিকবাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য। এর প্রবক্তা ফুকো, যিনি পাগলামিকে রোগ বলতে নারাজ, বলেন জ্ঞান, শৃঙ্খলা বা সিস্টেমের ভিন্নতা। গফুরের বড় ছেলে কবি আজিজুল হকের লেখা একমাত্র যে কবিতাটি[৩৯] মহল্লাবাসীর হাতে আসে, তারা সেটি পড়ে, তাদের প্রচলিত কাব্যধারণার অন্যথা দেখে, বিভ্রান্ত হয়, জটিলতায় আক্রান্ত হয়। কবিতাটিও বিভ্রমাত্মক। সে একদিন যখন 'লুঙ্গি ছাড়া মহল্লার রাস্তায় নেমে' পড়ে আর তাকে পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়া হয়, এতে 'মহল্লার বাতাস সুগন্ধে ভরে যায়'। আবার তারই ছোট সহোদর আমিনুল হক বিভ্রান্ত হয়ে ল্যাংড়া পুতুলের প্রেমে পড়ে এবং ফেরার পথ পায় না। বংশীবাদক আমিনুল হকের মৃত্যু ঘটে সর্পদংশনে। তার প্রেমকাহিনিও বিভ্রান্তিকর। মহল্লার তরুণেরা নাইট শোতে নিশাত সিনেমা হলে ছবি দেখতে যায় 'নাগিনীর প্রেম' এবং তারা বুঝতে পারে –

> অনেক সাপ নারী হয় এবং অনেক নারী, সাপ,...নারী সাপেরা সব সময় পুরুষদের ভালবাসে, নাগিনীরা প্রেম করে এবং প্রেমে পড়লে তারা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়;...আমরা পরে পুনরায় নিশাত মুকুল

> অথবা শাবিস্তান সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখি, বেহুলা; এই বইয়ে নায়িকা সুচন্দা নায়ক লখিন্দর রাজ্জাককে সাপের কামড়ের পরও রক্ষা করে, আমাদের কাছে পুতুল বেগমকে বেহুলার মতো মনে হয়, কিন্তু আমিনুল হককে সে রক্ষা করতে পারে না। (জহির : ২০০৪ : ১৩০)

উক্ত বর্ণনাংশে মিথিক বিষয়ের সিমুলেশন লক্ষ করা যায়। বেহুলা-লখিন্দর বাংলার লোকপুরাণের গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্র। তাদের সঙ্গে পুতুল-আমিনুলের প্রেম ও পরিণতির সূত্রায়ন ঘটে ফেবুলেশনের মাধ্যমে। আর পর্দার বেহুলা-লখিন্দর সুচন্দা-রাজ্জাকের সঙ্গে পুতুল-আমিনুলের সাদৃশ্যায়ন স্পষ্টতই সেলিব্রেটি-অনুকরণের এক দিক, যা সিমুলেশনের বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য গল্পের বর্ণনভঙ্গির বিযুক্ততা, কাব্যিক বিভ্রম, অব্যক্তের মাধ্যমে ব্যক্ত বিষয়াদি, ঔপভাষিক প্রয়োগ, একক অনুচ্ছেদে পূর্ণ গল্পের বিন্যাস ও অর্ধযতিতে সমাপ্তি প্রভৃতিতে উপস্থাপনগত যে অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে, এখনকার গল্প-পাঠকের কাছে তা অপরিচিতকরণ (ডিফেমিলারাইজড)[৪০]। 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পের নামকরণকৃত 'ইতিহাস', এর অন্তর্গত শিল্পায়ন, ব্যক্তিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পাঠ আর বহুমাত্রিক পাঠসম্ভব এই গল্পটি গল্পকারের উত্তর-আধুনিক নিরীক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

মাত্র উনিশটি গল্পে গল্পকার যেসব নিরীক্ষাজাত উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাতে বাংলাদেশের সাহিত্যে নতুন এক মাত্রা যোগ হয়েছে। শহীদুল জহিরের গল্প তথা কথাসাহিত্যের নতুনত্ব ও সক্ষমতা অনুধাবনের জন্য এই তথ্য জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে, সমকালিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সর্বাধিক আলোচিত ও চর্চিত এবং উত্তরকালে লেখক-পাঠকের অবশ্যপাঠ্য ও অনুকরণীয় লেখকরূপে গণ্য করা হয় তাঁকে। জীবদ্দশায় প্রায় অনালোচিত শহীদুল জহির ক্রমে তাঁর গল্পে তাঁর বয়ানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন, আর মহৎ মৃত লেখক এভাবেই জীবিত কিংবা পুনরুজ্জীবিত হন ভাবীকালে – তাঁর রচনাগুণে, পাঠকের চেতনায় ও চর্চায়। উত্তর আধুনিকবাদ তাঁর গল্পসমূহে রূপ পরিগ্রহ করেছে এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে শেকড়ায়িত হয়ে। তাই তত্ত্বচর্চার অনুষঙ্গ হিসেবে কেবল নয়, ইতিহাস ঐতিহ্য রাজনীতি ও নন্দনশৈলীর নবরূপায়ণের বিবিধ সূত্রে শহীদুল জহির বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব।

টীকা

১. বিশ শতকের আশির দশকে শহীদুল জহিরের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ, আর একুশ শতকের শূন্য দশকে শেষ গ্রন্থের। অর্থাৎ প্রায় দুই শতকের তিন দশক জুড়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন বিস্তৃত।

২. গ্রন্থাকারে তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস চারটি, ছোটগল্প গ্রন্থ তিনটি।

৩. শহীদুল জহিরের সাহিত্য বিশ্লেষণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ শামসুল হক ও গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কের্সের প্রভাবের কথা সমালোচকদের কেউ কেউ বলে থাকেন। লেখকও তাঁর সাক্ষাৎকারে তাঁদের প্রভাবের কথা মেনে নিয়েছেন।

৪. জাদুবাস্তববাদ (ম্যাজিক রিয়ালিজম) মূলত ইয়োরোপীয় পরিভাষা। এর দ্বারা বোঝানো হয় জাদু ও বাস্তব একই ক্যাপসুলের মধ্যে পুরে-থাকা ব্যাপার।

৫. লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি ঢাকা কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নকালে মার্কসীয় মতাদর্শে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, সমর্থক ছিলেন মেনন-পার্টির। তখন তিনি 'লাল বই' পড়তেন। উল্লেখ্য, শহীদুল জহির মাও সে তুং-এর কিছু কবিতারও অনুবাদ করেছেন।

৬. কর্মজীবনে শহীদুল জহির আমলা হিসেবে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে এ-সবের প্রতিফলন রয়েছে।

৭. শহীদুল জহির ছিলেন অকৃতদার। কলেজে অধ্যয়নকালে বামপন্থী রাজনীতিতে আগ্রহ থাকলেও পরে তিনি তা থেকে সরে আসেন। তাঁর পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-সহকর্মীদের স্মৃতিচারণ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যাপন সর্ম্পকে এসব জানা যায়। [দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত *শহীদুল জহির : স্মারক গ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১০]

৮. মার্কেসের কথাসাহিত্যে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ বা লা-ভিয়োলেন্সিয়া, মাকোন্দো গ্রাম, কর্ণেল চরিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিক টেক্সটে।

৯. সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের (১৯৮৯-১৭৯৯) পরবর্তী শিল্পসাহিত্য আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যবাহী। ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ফ্রান্সে, ১৮৯০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে জার্মানিতে, ১৯০০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে রাশিয়ায়, প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে এর বিকাশ ঘটেছিল। বলা প্রয়োজন, সমাজ-রূপান্তরের বিশেষ একটা সম্পর্কে যদি বলা হয় আধুনিক, আর সেই পর্বের কিছু কিছু লক্ষণকে যদি বলা হয় আধুনিকতা, তাহলে সেই সব লক্ষণকে সমাজ বয়ানে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাকে বলা যেতে পারে আধুনিকবাদ। দাদাইজম, ফরমালিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম প্রভৃতি আন্দোলনে, অস্তিত্ববাদী দর্শনে, প্রতীকবাদী কবিতায়, চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে ঘটেছিল আধুনিকবাদের প্রতিফলন। এটি একটি একক সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি। একটা 'মুড' ও 'মুভমেন্ট'– যা পৃথিবীকে প্রায় সোয়া শতাব্দী নিয়ন্ত্রণ করেছে। অরভিঙ হাউ (১৯২০-৯৩) আধুনিকবাদকে দেখেছেন প্রাক্তন শৈলীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসেবে। কাল মার্কস (১৮১৮-৮৩), সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৪৯)। ভিলফ্রিডো প্যারোটা (১৮৪৮- ১৯২৩) প্রমুখ হলেন এই মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক।

উনিশ শতকীয় সমাজ-প্রতিবেশের অনুধাবন ও আত্মচেতনা এই মতবাদের মূলে কার্যকর। এই চেতনা তৈরি হয়েছিল পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায়। তাই আধুনিকবাদী সাহিত্যিকগণ শিল্পকলার ধ্রুপদী বোধ ও উপলব্ধির বিরোধী ছিলেন। (আইয়ুব : ১৯৯৪ : ১৫-১৭) উত্তর-আধুনিকবাদের উদ্ভবের পেছনেও পরিবর্তিত আরেক সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল ছিল। সেই ব্যবস্থা (সিস্টেম) ছিল আধুনিক। এক অর্থে আধুনিকবাদের প্রতিক্রিয়া হলো উত্তর-আধুনিকবাদ।

১৮৭০ সালে জন ওয়াটকিনস চ্যাপম্যান (১৮৩২-১৯০৩) প্রথম Post-modernism শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। আর একে পূর্ণব্যবহার ও চর্চার মাধ্যমে অধিক সক্রিয় করে তোলেন পারসিক মার্কিন চিন্তক ইহাব হাসান (১৯২৫-২০২০)। (বন্দ্যোপাধ্যায়; ২০২১: ১৪)

তিনি এই প্রসঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্ততা বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তৈরি করেন। তাঁর মতে, উত্তর-আধুনিকবাদ এক সাহিত্যিক পরিবর্তনের রীতি। প্রাচীনতর আভাগার্ধ (কিউবিজম, ফিউচারিজম, ভাষাবাদ, পরাবাস্তববাদ প্রভৃতি) থেকে একে যেমন পৃথক করা যায়, একইভাবে আধুনিকতা থেকেও। (বন্দ্যোপাধ্যায়: ২০১১ : ১৪) তবে উত্তর-আধুনিকবাদের তত্ত্বীয় নির্দিষ্টতা সৃষ্টি হয় ফ্রাঁসোয়া লিয়োতারের (১৯২৪-১৯৯৮) হাতে, তাঁর *দ্য পোস্টমডার্ন* কন্ডিশন *: অ্যা রিপোর্ট অন নলেজ* (১৯৭৯) প্রকাশনার মাধ্যমে। জটিল সমাজ-রাষ্ট্রবিন্যাসগত জটিলতম মানবজ্ঞানের পরিবর্তিত প্রয়োগের যুগে পুঁজিবাদকে যখন সরিয়ে দেয়া অসম্ভব; তখন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরে এই রিপোর্ট। মহা-আখ্যানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র আখ্যান বা ডিসকোর্স, নব্য মার্কসবাদ, নব্য-নারীবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ, বহুত্ববাদ, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, পাঠকেন্দ্রিকতা, জেন্ডারবাদ, নব্য-ইতিহাসবাদ, জাদুবাস্তববাদ প্রভৃতির মাধ্যমে বিষয় ও শৈলীগত দিক থেকে উত্তর-আধুনিকবাদ তার চারিত্র্য-নির্ধারণ করে, তথা পূর্ববর্তী প্রভাবশালী তত্ত্ব আধুনিকবাদ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব নির্দেশ করে। তীব্র অভিযোজনক্ষম ও বুদ্ধিবাদী এই তত্ত্ব বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একক নয়- গুচ্ছ। অর্থাৎ বহু তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে উত্তর-আধুনিকবাদী তত্ত্ববলয়।

১০. সাময়িকপত্র 'কল্লোল' (১৯২৩)-এর লেখকদের হাত ধরে পশ্চিম-প্রভাবিত আধুনিকবাদী বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে সাহিত্যের মৃত্তিকালগ্ন জগৎ সৃষ্টি করা। এজন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ও বাস্তব জীবনকে সাহিত্য-রচনার বিষয় করে তোলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) প্রমুখের রচনায় নিম্নবিত্তের জীবনযুদ্ধ, মধ্যবিত্তের সংকটের প্রতিরূপ পাওয়া যায়।

১১. ক্ষমতাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকগণ হলেন ম্যাকিয়াভেলী, ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ নিৎসে, মিশেল ফুকো প্রমুখ। এক দশক পর্যন্ত ক্ষমতা সম্পর্কিত তত্ত্ব দু'ভাগে বিভক্ত; ১. জনগণের ওপর সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ২. বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মার্কসীয় চিন্তাধারা। - এই দুই তত্ত্বই সামষ্টিক পর্যায়ের। অপরদিকে নিৎসের রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে will to power বা ক্ষমতার ইচ্ছে, তিনি দেখেছেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ক্ষমতা। তাঁর ক্ষমতা-বাস্তবতার দুই দিক- ব্যক্তিগত ও সামাষ্টিক। নিৎসের মতে ক্ষমতার ইচ্ছে হারানো মানুষই দাস, আর ক্ষমতার ইচ্ছে ধারণকারীই মনিব। তাঁর ক্ষমতাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই দাস-মনিবের দ্বন্দ্ব। দাসরা বিভিন্ন সময় তাদের মনিব বা প্রভুদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করলেও এই দ্বন্দ্ব শেষ হয় না, বরং বারবার

ফিরে আসে। তাঁর ভাষায় একে বলা হয় Eternal recurrenc. ক্ষমতার বহু প্রকাশ ও প্রকারের কথা বলেন মিশেল ফুকো। তিনি সামাজিক বিন্যাসের অন্যতম উপাদান বিবেচনা করেন ক্ষমতাকে। তাঁর মতে, ক্ষমতার অর্থ শুধু নিষেধাজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নয়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ইচ্ছাও আসলে এক ধরনের ক্ষমতা (যৌনতার ইতিহাস)। (চৌধুরী : ২০১২:২৬৫) এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান ক্ষমতা সমাজ শরীরের সাথে সহব্যাপী, এটা নিশ্চিত যে সামাজিক নিয়ম অন্যান্য নিয়মের মতোই ক্ষমতাকে রূপ দেয়।

শৃঙ্খলিত ও অবদমিত সিস্টেমের ভেতর থেকে মানব-বোমা সৃষ্টি ও বিস্ফোরণের দৃষ্টান্ত *যৌনতার ইতিহাস* ও *জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব* গ্রন্থে ফুকো দেখিয়েছেন। এই ধারণার জন্য তার ঋণ মূলত নিৎসের কাছে, যেখানে তিনি নিৎসেকে অতিক্রমও করেছেন।

১২. সাবল্টর্নের এই কথা বলার প্রক্রিয়া কতোটা কঠিন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can The Subaltern Speak?' প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। [দ্রষ্টব্য : Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.) *Marxism and the Interpretation of Culture,* Urban, University of Illionois Press, 1988]

১৩. বাখতিনের আখ্যানতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্ম পলিফনি। কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে ব্যবহৃত অনির্বায সংলাপ-বৈচিত্র্য থেকে এর উৎপত্তি।

১৪. সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ (Cultural Metarialism) ১৯৬০-এর দশকে উদ্ভূত ও ১৯৮০-এর দশকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত তত্ত্ব। এটি সামাজিক অভিযোজন, সমাজ-অবকাঠামো (প্রযুক্তি, উৎপাদন ও বিদ্যমান কাঠামো/মূল্যবোধ ইত্যাদি), সমাজের গঠন (সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্ক) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। রেমন্ড উইলিয়ামস দেখান, এটি সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পণ্যের আধিপত্য ও নিপীড়নকেন্দ্রিক শ্রেণিভিত্তিক পদ্ধতি সম্পর্কিত তত্ত্ব। তিনি জোর দিয়ে বলেন – সংস্কৃতি নিজেই একটি উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া – যা সমাজে ধারণকৃত বস্তু, ধারণা, অনুমান ও সম্পর্কসমূহের মতামতকে তৈরি করতে ভূমিকা রাখে। (আসকারী : ২০০৩ : ১৬৮-১৭২)

১৫. ইকোক্রিটিসিজম-জাত টার্ম ইকো-স্টোরি, ইকো-ফিকশন ইত্যাদি। ইকো-ক্রিটিসিজম হলো সাহিত্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি।

প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন-মানুষের উদ্বেগ বাড়তে থাকে দেশে দেশে শিল্পায়নের প্রসারের ফলে প্রকৃতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির অনুধাবনে। গত শতকের সত্তরের দশকে এটি জোরালো আন্দোলন রূপ লাভ করতে থাকে। এ-সময়ই 'ওয়েস্টার্ন' লিটারেচার অ্যাসোসিয়েশনের (WLA) বিভিন্ন সভাতে তত্ত্বগতভাবে ইকোক্রিটিসিজমের ধারণাটি দানা বাঁধতে থাকে। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৭৮-

এ প্রকাশিত উইলিয়াম বুকার্ট-এর একটি প্রবন্ধ 'লিটারেচার অ্যান্ড ইকোলজি : অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন ইকোক্রিটিসিজম'-এ। এটি কেবল একটি শব্দ (টার্ম) হিসেবেই নয়, সাহিত্য-সমালোচনার একটি ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে ১৯৮৯-এ WLA কনফারেন্সের পরে। সেই কনফারেন্সে শেরিল গ্লটফেল্টি প্রথম তাঁর পঠিত প্রবন্ধে 'ইকোক্রিটিসিজম' শব্দটিকে কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেননি, 'স্টাডি অফ নেচার রাইটিং'-এর নামে সাহিত্য ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠিত ধারাটিকে আরও সুসংহত করে, নতুন ভাবনাকে জায়গা করে দিয়ে সেই ধারাটি 'ইকোক্রিটিসিজম' নামে চিহ্নিত হোক – এই প্রস্তাব রেখেছিলেন।

১৬. গল্পটির শেষে রচনাকাল উল্লেখ রয়েছে, ১৯৯১ সাল।

১৭. লিয়োতার দেখিয়েছেন বিজ্ঞান ও আখ্যানের জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্ক বৈরী, এবং বিজ্ঞান আখ্যানকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান নিজেকে তুলে ধরতে ও বোধগম্য করতে আখ্যানকে অবলম্বন করে। পদ্ধতিগত এই সূত্র বিপরীত সম্পর্কের হয়েও আখ্যান ও বিজ্ঞান নির্ভরশীল এক সম্পর্ক-সমীকরণে পৌঁছায়।

১৮. সর্বপ্রাণবাদ (animism) এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আত্মা। এ তত্ত্বের প্রবক্তা ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ বার্নেট টেইলর। প্রাচীন মানুষের আত্মা সম্পর্কিত ধারণা তৈরির ভিত্তি দুটি চেতনা -স্বপ্ন চেতনা ও মৃত্যুচেতনা। সর্বপ্রাণবাদ মূলত আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার প্রতিফলন। এ থেকে পরবর্তীতে প্রকৃতিপূজা ও একেশ্বরবাদী ধারণার উৎপত্তি বলে টেইলর মনে করেন। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃক্ষপূজা (তুলসী/বট) প্রাণী পূজা (সর্প/ মনসা) প্রভৃতি এই ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। আত্মার অবিনাশী ও পবিত্রতার ধারণা থেকে জন্মান্তরবাদেরও উৎপত্তি।

১৯. ফেবুলেশন (Febulation) মানে পুরনো রূপকথা-উপকথার ভঙ্গি ও আখ্যানকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা। এতে উত্তর-আধুনিক আখ্যান-রচনায় ত্রয়ী কৌশল প্যাস্টিচ, মেটাফিকশন ও ম্যাজিক রিয়ালিজমের ব্যবহার ঘটে থাকে। নিরেট বাস্তবতাকে পাশ কাটাতে বা খারিজ করতে কথাসাহিত্যিকগণ এই রীতি ব্যবহার করে থাকেন।

২০. উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যে কখনো কোনো টেক্সটের ভেতর এর লেখক বা বিষয় বা প্রকরণ অর্থাৎ নির্ধারিত লেখাটির যে-কোনো দিক নিয়ে লেখককে অনুপ্রবেশ করানো হয়। বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কৃত্রিম কথনরীতির পূর্বানুগ ধারাকে এটি প্রত্যাখ্যান করে।

২১. উত্তর-আধুনিকবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'হাইপার রিয়েলিটি'র কথা বলেন জ্যাঁ বদ্রিলার। গণমাধ্যমের প্রভাব ও অনুধাবন-বিষয়ক পরিভাষা সিমুলেশন (simulation)-এর ব্যবহারও তিনি করেন। বাস্তব একটি ব্যাপার, ঘটনা বা বিষয়কে যখন ভিন্ন কোনো বিষয়, ঘটনা বা ব্যাপার দ্বারা পরিবেশন, প্রদর্শন বা বোঝানো হয় এবং দ্বিতীয়োক্তটি প্রথমের নকল হয়েও নকল প্রতীয়মান হয় না, তখনই একে অভিহিত করা হয় হাইপার রিয়েল হিসেবে। মূলত বিজ্ঞানের পরিভাষা হিসেবে বদ্রিলার এর প্রয়োগ ঘটান। এ-ধরনের বাস্তবতার মধ্যে অবস্থান করে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও বোধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়। তাই একজন সেলিব্রেটি তার স্বাভাবিক জীবন-যাপনের অভ্যস্ততা থেকে বিচ্যুত হয়। সিমুলাক্রা (Simulacra) বলতে বোঝায় মূলের কপি, তবে তা মিথ্যে নয়। 'ডামি' শব্দটি দ্বারা এর অর্থের কাছাকাছি ব্যাপার পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। বদ্রিলার তাঁর সমসাময়িক উত্তর-কাঠামোবাদী ধারণার সমীপবর্তী হয়ে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তার কাঠামো ও উপস্থাপনার সীমানা ভেঙে দিতে চেয়েছেন। এছাড়া লাকাঁর 'দর্পণস্তর' (The mirror stage) ও 'কাল্পনিকতা' (Imaginary) – এই ধারণাদ্বয়কে কাজে লাগিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি মূলত উৎপাদন, শ্রম, মূল্যমান, মানবপ্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে কাল্পনিক প্রতীতির পক্ষপাতী। বস্তুনিষ্ঠভাবে ড্যানিয়েল বেল (১৯৯৯-২০১৯) তাঁর গ্রন্থসমূহে বিশেষত *দ্য কামিং অব পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি : অ্যা ভেঞ্চার ইন সোশ্যাল ফরকাস্টিং* (১৯৭৬)-এ 'তথ্য-অর্থনীতি' ও 'কাঁচামাল-অর্থনীতি'-নির্ভর যে সমাজের গঠনকে সামনে আনেন, সেই

সমাজের ব্যক্তি-চিন্তা ও বোধের প্রকাশই সামনে আনেন বদ্রিলার তাঁর হাইপার রিয়েলিটি কিংবা সিমুলেশন-তত্ত্বে।

২২. দলয়জ বিশাল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে (ক্ষমতাকাঠামোকে) ও এর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিকে বাইরে থেকে আক্রমণের জন্য নতুন এক পদ্ধতির কথা বলেছেন, এর নাম রাইজোম (Rhizom)। উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিভাষায় এর অর্থ – কাণ্ড নেই, শাখা-প্রশাখা নেই, মাটির তালয় বেড়ে ওঠা এক ধরনের উদ্ভিদ (যেমন : পেঁয়াজ, আদা প্রভৃতি)। উত্তর-আধুনিকতার ব্যাখ্যায় ঐতিহ্য নেই, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য নেই এমন বস্তু/বিষয় হলো রাইজোমিক।

২৩. শহীদুল জহিরের তৃতীয় তথা শেষ গল্পগ্রন্থে 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় গ্রন্থভুক্ত এই গল্পটির নির্ভুল পাঠ রক্ষিত হয়নি। 'ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প'-তে পূর্ণযতিহীন এই গল্পের পুনর্মুদ্রণ যুক্ত হওয়ায় আমরা এই গ্রন্থের গল্প-ক্রমিক আলোচনায় উক্ত গল্পকে গ্রহণ করবো।

২৪. চীন-সোভিয়েত (Sino-Soiet Split) ভাঙনের সময় ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে শুরু হওয়া উগ্র বামপন্থী আন্দোলন এটি। পরে এই আন্দোলন তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ (বর্তমান ছত্তীসগড়) ও অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ক্রমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। মতাদর্শগতভাবে এরা চীনের মাও সেতুং-এর অনুসারী। চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ এ-আন্দোলনের নেতা। এর সূচনা সাল ১৯৬৭ সনের ২৫মে। শ্রেণিশত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের উৎখাত ও সর্বহারা কৃষক শ্রমিকের কল্যাণ এদের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের উদ্ভবকালের প্রায় সমসময়ে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে, শুরু হয় এই অঞ্চলেও নকশাল আন্দোলন।

২৫. স্যামুয়েল ব্যাকেট (১৯০৬-১৯৮৯)-কে 'থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড'-এর জনক বলা হয়। আইরিশ এই ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারকে কেউ কেউ 'লাস্ট মডার্নিস্ট' হিসেবে অভিহিত করলেও রচনা-বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে উত্তর-আধুনিকবাদেরই গোত্রভুক্ত ধরা হয় তার সৃষ্টিকর্মকে। বিশেষত তাঁর বিখ্যাত নাটক *ওয়েটিং ফর গডো*তে প্রতিফলিত থিম 'অর্থহীনতা বা কিছুই না ঘটা'র ব্যাপারটি উত্তর-আধুনিকবাদ সমর্থন ও গ্রহণ করে এবং তাঁকে এই মতবাদের অন্যতম রূপকারের স্বীকৃতি প্রদান করে। (সূত্র : ইউকিপিডিয়া)

২৬. প্যাস্টিচ (Pastiche) মানে অনুকরণজাত-সংস্থাপন। সংলাপ বা কথনভঙ্গির যাথার্থ্য প্রতিপন্নে উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যে এর প্রয়োগ ঘটে থাকে। এর মধ্যে কখনো পুরনো/প্রচলিত সাহিত্যিক বা অন্যবিধ উপকরণ, যেমন : ভাষণ, ধর্মবাণী প্রভৃতির সরাসরি প্রয়োগ ঘটে।

২৭. ক্ষমতার শ্রেণিকাঠামোর তলানিতে এর অবস্থান; অদৃশ্য-অর্থে বা পঙ্‌ক্তিভুক্তির বাইরে।

২৮. মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দরের মা সনকার কাছে চারটি নিদর্শন রেখে বেহুলা ভাসান-যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করে। কবি বিজয়গুপ্তের ভাষ্যে–

চরণে মেলানি দেও প্রভুর সঙ্গে যাই।
চারি নির্দশন আমি তোমা স্থানে দেই ॥
হের দেখ সাইল ধান সিজান শুখান।
ভাজা কলই দেখ করে ঠন ঠন ॥
আর দেখ হরিদ্রা সিজান শুখান।
এই তিন দ্রব্য দেখ থুইলাম বিদ্যমান ॥
সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে অঙ্কুর।
তবে জানিবা বেউলা গেল দেব পুর ॥

সিদ্ধ হরিদ্রায়ে যদি মেলিলেক গেজ।
তবে জানিলা বেউলা সাধিল নিজ কাজ ॥
ভাজা কলই মেলিলেক পাত।
তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ ॥
আকসালে চড়াইছি ভাত হেটে নাহি জ্বাল।
সম্পূর্ণ জ্বাল দিয়া এড়িছি চিরকাল ॥
বিনে জ্বালে ফোটে যদি সেই ভাত হাঁড়ি।
তবেসে জানিবা বেউলা দেশেতে বাহারি ॥
বেউলার বচনে সোনাই পড়িল ভূমিত।
মেলানি মাগিয়া বেউলা চলিল ত্বরিত ॥ (বিজয়গুপ্ত : ১৯৬২ : ৪৪৩-৪৪৪)

২৯. *ঠাকুরমার ঝুলির* 'সাতভাই চম্পা' রূপকথায় সৎমায়েদের ষড়যন্ত্রে মাটিচাপা দেয়া ছোটরানির সাতপুত্র ও এক কন্যার গাছরূপে বেড়ে ওঠার কাহিনি স্মর্তব্য।

৩০. মার্কেসের *নিঃসঙ্গতার একশো বছর* উপন্যাসের শেষদিকে বুয়েন্দিয়া পরিবারের শেষ বংশধরের শুয়োরের লেজসদৃশ লেজ নিয়ে জন্ম ও পিঁপড়েদের দ্বারা শিশুটিকে টেনে নিয়ে যাবার বর্ণনা স্মর্তব্য।

৩১. প্যারাডাইম শিফট মার্কিন পদার্থবিদ ও দার্শনিক টমাস কুনের (Thomas Kuhn, ১৯২২-১৯৯৬) প্রবর্তিত পরিভাষা। কুন যদিও পরিভাষাটিকে ন্যাচারাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তবু পরে এটি বিজ্ঞানের বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং শিল্প-সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে একটি মৌলিক মডেল বা ঘটনার ধারণার গভীর পরিবর্তন বর্ণনার ক্ষেত্রে। কুন এই পরিভাষাটির কাঠামো সৃষ্টি করেন *দ্য স্ট্রাকচার অব সায়েন্টিফিক রেভুল্যুশনস্* (১৯৬২) গ্রন্থে।

৩২. Peter Barry তার *Begining Theory* গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> ...narratology, which we can define more closely as the study of how narratives make meaning, and what the basic mechanisms and procedures are which are common to all acts of story-telling. Narratology, then, is not the reading and interpretation of individual stories, but the attempt to study the nature of 'Story' itself as a concept and as a cultural practice. (Barry : 2018 : 223-224).

৩৩. একে ন্যারেটোলজিস্টদের প্রধান ও মৌলিক কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন পিটার ব্যারী।

৩৪. বর্ণনবিদ্যা-অনুযায়ী গল্পের দুটি অংশ – blocks হচ্ছে প্রাথমিক (Primary) বা 'frame' অর্থাৎ প্রারম্ভিক বিষয়। আর দ্বিতীয় (Secondary) অংশ হচ্ছে মূল বিষয় (embedded) । (ব্যারী : ২০১৮ :২২৫)

৩৫. উত্তর-আধুনিক (বিশেষত আমেরিকান) লেখককুল 'plot'-এর বদলে 'discourse'-এর ব্যবহারকে শ্রেয়তর মনে করেন। কারণ 'plot'-এর প্রচলিত সংজ্ঞায়ন সাম্প্রতিক গল্প অনেকটাই উপেক্ষা করে থাকে। তাছাড়া প্রয়োগগত দিক থেকে 'plot'-এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে সমগ্র রচনাটি। তাই বিশেষ প্রয়োগে 'plot'-এর পরিবর্তে 'ডিসকোর্স' প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁরা।

৩৬. জেন্ডার স্টাডিজ নর-নারীর সামাজিক লিঙ্গ-ধারণার বহিঃপ্রকাশক তত্ত্ব। অর্থাৎ জৈব লিঙ্গ ও সামাজিক বা আদর্শিক লিঙ্গগত ধারণা ও এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে জেন্ডার স্টাডিজ কাজ করে।

৩৭. ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশবাদী নারীবাদ নারীবাদী তত্ত্বের উত্তর-আধুনিক সংযোজন। এই তত্ত্ব প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে সাদৃশ্যময়তা আবিষ্কার করে এবং মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির ধ্বংস বা আধিপত্যকামী আচরণের বিরূপতার সঙ্গে পুরুষ কর্তৃক নারীকে অবদমন ও আধিপত্যকামিতার তুলনা করে উভয়বিধ নেতিকে তুলে ধরে এর থেকে উত্তরণ অনুসন্ধান করে। নারী-ইচ্ছা, নারী-মুক্তি ও নারী-স্বভাবের সহজাত বিচরণ ও প্রতিষ্ঠার কথা বলে ইকোফেমিনিজম।

৩৮. মিশেল ফুকো তাঁর *The History of Sextuality* গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় যৌন অবদমনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্ষমতায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। মঈন চৌধুরী এ বিষয়ে লিখেছেন-

> ক্ষমতার বিচিত্র রূপকে উন্মোচন করার মাধ্যমে মিশেল ফুকো যৌনতাকেন্দ্রিক সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তারিতভাবে, যেখানে ফ্রয়েডীয় অবদমনের ভূমিকা উপস্থিত হয় নিতান্তই গৌণ উপাদান হিসেবে। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সমাজের যৌনাচার, যৌনাচারকেন্দ্রিক ট্যাবোর উৎপত্তি এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ট্যাবো ভাঙার প্রক্রিয়া উল্লেখ করে; ফুকোর বক্তব্য হচ্ছে – ক্ষমতার অর্থ শুধু নিষেধাজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নয়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ইচ্ছাও আসলে এক ধরনের ক্ষমতা। (চৌধুরী : ২০১২ : ২৬৫)

৩৯. আজিজুল হকের কবিতাটি এরকম –

> তিনটি বিন্দু ছিল সামনে/ডানে বাঁয়ে এবং/ মাঝখানে/অথবা/ একটি রেখা ছিল/ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা/ বাম থেকে ডানে/অথবা একটি বাক্য ছিল রেখার মতো/কারণ, অর্থ ছিল না/ কারণ, তখন বাক্য রেখা ছিল/ এবং রেখা বিন্দু ছিল, অথবা/ তখন অর্থ ছিল/রেখা তখন বাক্য ছিল/এবং বাক্য জীবন ছিল/কারণ, তখন স্বপ্ন ছিল/বাক্য তখন কথা ছিল;/কিন্তু তখন স্বপ্ন ছিল না/আমরা জাগরণের পীড়নের ভেতর নিদ্রিত ছিলাম/আমাদের নিদ্রার ভেতর ভালবাসার অঙ্কুর ছিল না/কারণ, তখন বাক্য রেখা ছিল/ রেখা তিনটি বিন্দু ছিল/মাটিতে/পানিতে/এবং আকাশে/কারণ, তখন অর্থ ছিল না/ এবং তোমার কথা/ অন্য কথা ছিল; (জহির : ২০০৪ : ১২২)

৪০. সাহিত্যের বিষয়, ভাষা, রূপ, শৈলী প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত/ব্যবহৃত/প্রচলিতের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে উপস্থাপনই অপরিচিতকরণ (Defamiliarization)। স্পষ্টতই এটি বিষয়ের তুলনায় নির্মাণরীতিকে প্রাধান্য দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, সালাহউদ্দীন [১৯৯৪], *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯], *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আজম, মোহাম্মদ [২০২৩], *মিখাইল বাখতিন : যাপিত জীবন ভাষা ও উপন্যাস*, প্রকৃতি, ঢাকা

আসকারী, রাশিদ [২০০৩], *উত্তর আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, ফেন্ডস বুক কর্নার, ঢাকা

ইউসুফী, এজাজ [২০০৬], *উত্তর আধুনিকতা* : নতুন অন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিত, বাতিঘর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ, ২০০১)

কামাল, বেগম আকতার (সম্পা.) [২০১৪], *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা

চক্রবর্তী, অভিজিৎ [২০০৩], *জাক দেরিদা*, রক্তকরবী, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭)

চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.) [২০১৪], *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, নবযুগ, ঢাকা

চৌধুরী, মঈন [২০১২], *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নদী, ঢাকা

জহির, শহীদুল [২০০৪], *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

[২০০৭], *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, সমাবেশ, ঢাকা

দাশ, জীবনানন্দ [২০১৬], *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

নারঙ, গোপীচন্দ [২০১৬], *গঠনবাদ, উত্তর গঠনবাদ, এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব*, সোমা বন্দোপাধ্যায় (অনু.), সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ, ২০০৯)

বন্দোপাধ্যায়, অমল [২০১১], *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক, এবং মুশায়েরা*, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম [২০০৭], *পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

বিজয়গুপ্ত [১৯৬২], *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*, শ্রী জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত (সম্পা.), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ব্যারী, পিটার [২০১৮], *বিগিনিং থিওরি*, ড. রুহুল আমীন (অনু.), ফ্রেন্ডস বুক কর্নার, ঢাকা

ভট্টাচার্য, তপোধীর [১৯৯৬], *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা [১৯৯৭], *জাঁ বদ্রিলার : সময়ের চিহ্নায়ন*, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যয়, পার্থ (সম্পা.) [১৯৯৮], *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

মাজী, বিপ্লব (প্রকাশকাল অনুক্ত), *ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

মার্কেস, গাবরিয়েল গার্সিয়া [২০০০], *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*, জি এইচ হাবীব (অনু.), সন্দেশ, ঢাকা

[২০১০], গল্পসমগ্র, অমিতাভ রায় (অনূ.) দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ, ২০০৬)

শূর, চিরঞ্জীব (সংকলিত) [২০১৬], *মিশেল ফুকো*, আলোচনাচক্র, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮) (সংকলিত) [২০১৭], *মনন বিশ্ব পরিচয়*, আলোচনাচক্র, কলকাতা (প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬-৯৯)

সেন, নবেন্দু (সম্পা.) [২০১৮], *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা* (চতুর্থ সং.), রত্নাবলী, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ, ২০০৯)

রশীদ, মোহাম্মদ আবদুল (সম্পা.) [২০১০], *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

রহমান, জিললুর [২০১০], *আধুনিকোত্তরবাদের নন্দনতত্ত্ব : কয়েকটি অনুবাদ*, লিরিক, চট্টগ্রাম

রায়, অলোক (সম্পা.) [২০১০], *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭)

রায়, দেবেশ [১৯৯১], *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

[১৯৯৪], *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Barry, Peter [2011], *Begining* Theory *: An Introduction to Literary and cultural theory,* Viva Books, New Delhi, India

Dentith, Simon [1995], *Bakhtin thought*, Routledge, London

Lyotard, Jean-fracois [1986], *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge,* Manchester University Press, UK.